Registered

মূল্য ঃ দুই টাকা

এক

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পরিচিত বিপ্লবী সূত্রগুলোকে অর্থহীন জপমন্ত্রের মত মুখস্থ করে আউড়ে চলা এবং প্রতিপদে বাস্তব পরিবেশকে অগ্রাহ্য করে বৈপ্লবিক সংগ্রামের নামে অতি বামপন্থার দিকে গিয়ে আন্দোলনকে বানচাল করে দেওয়ার যে প্রবণতা তারই নাম ডগ্‌মাটিজম-সেক্‌টারিয়ানিজম।

—ত্রিদিব চৌধুরী

গণবার্তা

সূচি.....	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১
ভারতের সাধারণ জনজীবন মোদি-শাহ'র অপশাসনে বিপর্যস্ত	১
দেশে বিদেশে	২
শিক্ষার মৌলিক পুনর্গঠন...	৩
বামফ্রন্টের আবেদন	৪
মোদি উত্থানের পশ্চাদপট	৫
দীর্ঘদিন পর স্কুল খোলার অনুমতি	৬
ইউরেশিয়ায় ডামাডোল	৭
আরএসপি'র প্রার্থী তালিকা	৮

68th Year 44th Issue ★ Kolkata ★ Weekly GANAVARTA ★ Saturday 12th Feb. & 19th Feb. 2022 Joint Issue

সম্পাদকীয়

গণতন্ত্রের প্রকৃত সংজ্ঞা বিকৃত হয়ে পড়েছে

বিভিন্ন রাজ্যে যেভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে সংসদীয় গণতন্ত্রের গণতান্ত্রিক ভিত্তিটা সম্পর্কেই দেশবাসী ক্রমশ সন্দিহান হয়ে পড়ছেন। সাংবিধানিক গণতন্ত্রের আবশ্যিক অধিকারসমূহ যথা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যপরিষেবা, বাসস্থান, সুষম খাদ্যের অধিকার ও ধর্মসংস্কৃতি, ভাষা ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমানাধিকার ক্রমশ অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। শুধু শাসনক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে পাঁচ বছর পর পর একটি ভোট দেওয়ার অধিকারই যেন গণতন্ত্রের একমাত্র সূচকে পরিণত আজ।

সেই বিশেষ একদিনে ক্ষমতাসীন দলগুলি একদঙ্গল দুর্বৃত্তের সহায়তায় সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্য/কেন্দ্রীয় প্রশাসনকে কিভাবে ব্যবহার করবে, সেটাই নির্বাচনী সাফল্যের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ রাজ্যের সাম্প্রতিক পৌরনিগমগুলির নির্বাচন প্রক্রিয়া ও ফলাফলে তার সাক্ষ্য জাজ্বল্যমান।

সমাজব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তরে প্রত্যয়ী বামদলসমূহের কাছে এই কর্পোরেট ও স্যাঙাৎ পুঁজিপতি সহ দুর্বৃত্ত প্রভাবিত সংসদীয় আধা-খেঁচড়া গণতন্ত্রকে কিভাবে গণআন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যবহার করা যাবে সেটা আজ ক্রমশ দুর্মর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই অর্থশক্তির দাপট ও প্রচারমাধ্যমের উপর আধিপত্য শুধু নয়, জাতপাত ধর্ম সম্প্রদায় ও আঞ্চলিক পরিচয় সত্তাকে অনৈতিকভাবে ব্যবহার করা কী হচ্ছে। এ সবের প্রতিরোধে রুখে না দাঁড়ালে মানুষের শোষণ বঞ্চনা পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের ধ্বংস ও শ্রেণি অবস্থানের বিষয়গুলি ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে পড়বে।

অথচ কঠিন বাস্তবতা, বিশেষ করে, গত দু'বছরে বেকারত্ব ক্ষুধা আত্মহত্যা অতিমারির প্রকোপে সরকারি ব্যর্থতায় লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ও ঘরছাড়া প্রবাসী শ্রমিকদের অবর্ণনীয় দুর্দশা সত্ত্বেও সেভাবে স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ দানা বাঁধছে না কেন? আর সংগঠিত বাম গণতান্ত্রিক শক্তিই বা রুটিন মাফিক কর্মসূচির বেড়া ভেঙে দিয়ে দেশব্যাপী তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তুলতেই বা ব্যর্থ কেন?

ভোট এলেই সর্বব্যাপী প্রতিক্রিয়ার আবহে আশুলাভের আশায় আঞ্চলিক এবং জাতীয় দলগুলি বিভিন্ন ধরনের পরিচিতি সত্তায় ইন্ধন জোগায়। এর নেতিবাচক প্রভাব যুক্তি দিয়ে মেনে নিয়েও অনেক তথাকথিত গণতান্ত্রিক শক্তি এই রণকৌশলের সঙ্গে আপস করছে। চূড়ান্ত পর্যায়ে এই নির্বাচনী কৌশল শুধু জাতীয় সংহতি নয়, শ্রম ও শ্রমিকের অবাধ চলাচলের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে অর্থনীতিরই ক্ষতিসাধন করছে। ফ্যাসিবাদী বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে অজস্র ইস্যু রয়েছে। তৎসত্ত্বেও পাঞ্জাবের কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী শুধুমাত্র পাঞ্জাবীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা বলে আঞ্চলিকতার সংকীর্ণ পথে গেছে। বিজেপি আপ প্রভৃতি দল স্ব স্ব শাসিত রাজ্যে একই পন্থা গ্রহণ করেছে। কিন্তু অতি চালাকির পথে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জাতীয় সংহতি ভাঙার অভিযোগ করার সুযোগ নিচ্ছে বিজেপি ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি।

আধাখেঁচড়া সংসদীয় গণতন্ত্র অনুশাসিত নির্বাচনের এইসব দুরপনেয় অমঙ্গলকে বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েই বামপন্থীদের গণতন্ত্র রক্ষা ও প্রসারের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। সামাজিক সাংস্কৃতিক তথা সামাজিক অন্যায় ও শোষণের প্রতিটি বিষয়কে সামনে রেখে শ্রমিক কৃষক ছাত্র যুব মহিলা সহ সমাজের নিম্নবর্গ মানুষদের সংগঠিত করে সংসদের সীমিত পরিসরে ও মাঠে ময়দানে লড়াই একমাত্র বিকল্প।

ইতিহাস শিক্ষা দিয়েছে, অনেক সময় আগাম জানান না দিয়েই গণতান্ত্রিক সংগ্রামে উৎসগুলি মুক্ত হয়ে যায়। মানুষ পথে নামে। জীবন-মৃত্যু তুচ্ছ করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সম্প্রতি দিল্লীতে আমরা দেখেছি দীর্ঘস্থায়ী কৃষক আন্দোলন কিভাবে ফ্যাসিবাদী সরকারকে পিছু হঠতে বাধ্য করেছে।

হয়তো বা সেভাবেই উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে এই অন্ধকারের মধ্যেও আলোর রেখা ফুটে উঠবে। রাজনৈতিক ঘূর্ণিতে বিজেপি'র অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। কৃষক আন্দোলনের প্রভাব পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে বিজেপির ভিত দুর্বল করে সেই অঞ্চলে আর এল ডি কে সামনে নিয়ে আসতে পারে। সংখ্যালঘু নিপীড়নের বিরুদ্ধে মুখ হয়ে উঠতে পারে এস পি, আর এল ডি কংগ্রেস ও বামপন্থীরা। প্রিয়ঙ্কার নেতৃত্বে ৪০ শতাংশ মহিলাদের প্রার্থী করে নারী জাগরণের শ্লোগান হয়তো গণতন্ত্রের অপ্রত্যাশিত অভিমুখ সৃষ্টি করবে। এইসব ইতিবাচক সম্ভাবনার ভিত্তিতে দেশজুড়ে বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নতুন সম্ভাবনা দেখা দেবে না, কে বলতে পারে!

ভারতের সাধারণ জনজীবন মোদি-শাহ'র অপশাসনে বিপর্যস্ত

ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী বিকল্পের অভাব বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে

যে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রধানমন্ত্রী উদ্ধত, বাক্‌সর্বস্ব এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ হন, সেই দেশের সাধারণ মানুষের জীবনে বিড়ম্বনা অন্তহীন। রাষ্ট্রপ্রধান নির্লজ্জ হলেও কলমচি কিভাবে বলেন যে, তিনি বাচাল! প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা কোনো মন্তব্য তা, যতই ব্যাকরণগত বা ভাবগত ভাবে সঠিক হোক্, বলা যায় না। লেখা তো যায়ই না। যে কোনো দেশেই শীর্ষস্তরের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের একটি ন্যূনতম যোগ্যতা থাকতেই হয়।

সরকারপক্ষ কিংবা বিরোধীপক্ষ উভয়দিকেরই রাজনৈতিক কুশীলবদের কাছে দেশের সাধারণ মানুষের কাছে তা ন্যূনতম চাহিদা। বহু ধরনের প্রবঞ্চনা এবং অপ্রাপ্তি যে কোনো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এমন কোনো বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা সারা দুনিয়ায় নেই যেখানে কম বেশি তঞ্চকতা সেই রাষ্ট্রের সাধারণ জনজীবনকে আচ্ছন্ন করে না। উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলিতে বঞ্চনার সাতকাহন উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। প্রাগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও বৈষম্যমূলক আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যের সন্ধানও লক্ষ করা যায়। আবার কোনো কোনো ক্ষুদ্র অর্থাৎ, জনসংখ্যার বিচারে স্বল্পতা ও সেই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতমানের কারণে রাষ্ট্রীয় বিত্ত বৈভবের অংশ সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে চলে আসে। এগুলিকে ব্যতিক্রমী বলে আখ্যায়িত করা যায়।

আমাদের দেশের বর্তমান আর্থরাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ করলে নিশ্চিতই এক ভীতিজনক অনুভূতি হয়। দেশের প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ক্রমাগত সাধারণ জনজীবনের ন্যূনতম নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। দেশের সরকার চরম দায়িত্বজ্ঞানহীন বা অবিমৃশ্যকারী অর্থনৈতিক নীতি নিয়ে দেশের মধ্যে অভূতপূর্ব এক সংকটের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়ে চলেছে। করোনা সংক্রমণ নিশ্চিতই সার্বিক পরিস্থিতিকে বিশেষ ঘোরালো করে তুলেছে। কিন্তু এই অতিমারি সন্ত্রাস শুরু হবার আগেই ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনমন শুরু হয়েছে। জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। দেশের সর্বত্র অতিমারির মতই কর্মহীনতা ভয়ার্ত করে তুলেছে যুবজীবনকে। নতুন কর্মসংস্থানের সামান্যতম সুযোগও অপসৃত। নতুন করে কোনো শিল্পউদ্যোগ গড়ে না ওঠার ফলে সাধারণ মানুষের কাছে জীবিকার কোনো সুযোগই আর নেই।

একদিকে বেকারত্বের জ্বলন্ত সমস্যা আর অন্যদিকে বিশ্বপুঁজিবাদ প্রণোদিত নয়া উদারবাদী অর্থনীতির ব্যাপক প্রয়োগ। দুইয়ে মিলে এক নিরবচ্ছিন্ন সংকটের ঘোর অন্ধকার। সমস্ত জিনিসপত্রের দাম আকাশস্পর্শী। মানুষের রোজগার নেই। হাতে অর্থ নেই। চাহিদা নির্মিত হওয়া অসম্ভব। ব্যবসা বাণিজ্য যাও বিকশিত হতে পারতো তা, এক দূরতম অসম্ভব্যতায় আকীর্ণ হয়ে পড়েছে। জনজীবন দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে চলেছে। হাতে গোনা সামান্য কিছু সংখ্যক মানুষের বিলাসব্যসনপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করার মতো সম্পদ একত্রিত হয়ে চলেছে। দেশের কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যক্ষভাবে এইসব হাতে গোনা বিপুল ধনরাশির মালিকদের মদত করছে এবং তাদের সম্পদ জ্যামিতিক হারে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতীতে কংগ্রেসশাসনকালেও এই ধারা চলেছিল কিন্তু তার গতি এমন তীব্র ছিল না। স্বীকার করতেই হবে যে, বর্তমান সরকার পূর্ণত বর্বরতার পরিচয় দিচ্ছে।

এখন এক বিরূপ অবস্থার মধ্যেই দেশের সরকার নিদারুণ ভাবে দেশের শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য ও সংহতি বিনাশের লক্ষ্যে নির্লজ্জভাবে অসদাচরণ করে চলেছে। ওসব আচরণের পর্যায় বলতে গেলে, সভ্যতার গণ্ডি পর্যন্ত অতিক্রম করে যাচ্ছে। দেশের মানুষকে মানুষ হিসেবে গণ্য করার রেওয়াজ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ নামক ফ্যাসিবাদী অপশক্তির কোনকালেই নেই। এবং বিজেপি দলটি আর এস এস-এর একান্ত অনুগত এক রাজনৈতিক সংগঠন। অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, বিশেষ করে, নরেন্দ্র মোদির মতো এক উগ্র হিন্দুত্ববাদের প্রচারক দেশের আপামর মানুষকে জাতপাতের ভিত্তিতেই বিভক্ত করে নিজেদের পুঁজিবাদের সেবক বলে প্রতিষ্ঠিত করার অপকর্ম করেই চলবে।

বিগত প্রায় আট বছরব্যাপী এই লক্ষ্যেই মোদি সরকার চলছে। অন্যান্য বহুবিধ প্রসঙ্গে পূর্ণ বিরতি বা সাময়িক বিরতি লক্ষ করা গেলেও সাম্প্রদায়িকতার বিস্তারে সদা সজাগ মোদি স্বয়ং। নির্লজ্জভাবে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে তিনি একান্তভাবেই আত্মগরিমা প্রচারে সদা ব্যস্ত। এই পথে চলার ফলেই দেশের অর্থনীতি আরও বিধ্বস্ত হয়েছে। জনজীবনে চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে। হাজার হাজার মানুষ আত্মহত্যার মতো পরিত্যাজ্য পথে নিজেদের শেষ করে পরিস্থিতির তীব্রতা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার চেষ্টা করছেন।

কৃষক আত্মহত্যা তো ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। মোদি অবশ্য নিজের বুক চাপড়ে সটান মিথ্যা বলে চলেছেন যে, তাঁর আমলে কৃষকদের উপার্জন দ্বিগুণ হয়েছে। ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান দাবি কৃষিপণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সম্পর্কে মোদি সরকার এখনও পর্যন্ত কোনো কার্যকর সিদ্ধান্তই নেয়নি। এখন মরীয়া হয়ে ভোটের প্রচারে মোদি স্বয়ং মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে চলেছেন।

দেশের সার্বিক দূরবস্থার মধ্যেই উত্তরপ্রদেশ, গোয়া, উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব এবং মণিপুরের বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের স্বতন্ত্র এবং নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নিয়ে বহুবিধ প্রশ্ন উঠেছে। উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন মোদি এবং তাঁর দল বিজেপি'র কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৪-এর সাধারণ নির্বাচনে মোদির জয় পরাজয় অনেকটাই নির্ভর করছে উত্তরপ্রদেশের ৪০৩টি আসনে জয়লাভের ওপর। এই রাজ্যে ৮০টি লোকসভা আসন। ২০১৯-এর নির্বাচনে বিজেপি এই রাজ্য থেকেই বিপুল সংখ্যক আসন লাভ করেছিল। এবারে অবস্থা রিরূপ।

মোদি এবং শাহ বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। বিগত সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সহ যে সব রাজ্যে নির্বাচন হয়েছে সর্বত্রই বিজেপি পরাস্ত। মোদি ম্যাজিক বলে কিছুই অবশিষ্ট নেই। চরম ব্যর্থ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনেও বিজেপির আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে না বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। আর মোদির দল মরীয়া হয়ে কুৎসিত সাম্প্রদায়িক বিভাজনের পথে অবনত। হিংস্র মেরুকরণ করে

এরপর ৪ পাতায়

ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাচারের মধ্যে খুব ফারাক নেই

কয়েক মাস আগে দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি পর্যুদস্ত হয়েছে। কোনও এক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তো আত্মশ্লাঘায় ভুগতে ভুগতে ছাপান্ন ইঞ্চির মধ্যে পরিত্রাতারূপে ভারত বিজয়ের স্বপ্নও দেখছেন। স্বপ্ন তো দেখতেই পারেন, কিন্তু সমস্যা হল, হয়ত এদের মাথায় নেই যে, বিজেপি আসলে দেশের মাটিতে ফ্যাসিস্ট শক্তির বাহক। এদের সক্রিয়তা কেবল নির্বাচনী ফ্রন্টেই সীমাবদ্ধ নয়—রাজনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি—সব ফ্রন্টেই ফ্যাসিবাদী আক্রমণ নেমে আসছে। ভারতীয় শিল্পপতিদের পরম মিত্র নরেন্দ্র মোদী উগ্র হিন্দুত্ববাদের নৌকায় চড়ে বিশ্বায়ন উদারনীতির বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে নয়া অবতাররূপ রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত। তাও বেশ কয়েক বছর অতিক্রান্ত।

দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফেরার পর থেকেই মোদী সরকার সংবিধানের ৩৭০ এবং ৩৫এ ধারা বাতিল করা, রামমন্দির নির্মাণ, নতুন শিক্ষানীতি ইত্যাদি সঙ্ঘ পরিবারের কর্মসূচি একের পর এক রূপায়ণ করেছে। বাকি রয়েছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের আইনের মতো পরিকল্পনাগুলি। মোদী সরকারের আইনমন্ত্রী জানিয়েছেন নতুন আইন কমিশন অভিন্ন দেওয়ানি বিধির বিষয়টি পর্যালোচনা করে যত দ্রুত সম্ভব অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা Uniform Civil Code চালু করবে। প্রত্যাশা মতই কয়েকটি বিরোধী দল এই বিলের সমালোচনা করে বলেছেন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিরোধী এমন স্পর্শকাতর বিষয়ে আলোচনা দরকার। আসলে ভোট বাক্সের দিকে নজর রেখে জনমানসে বিভাজন তৈরির লক্ষ্যে এই বিল আনার প্রস্তুতি চলছে।

এদিকে রাজ্যসভায় বিজেপির পক্ষ থেকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিল আনা হয়েছে। এই বিলটি বিশেষ একটি সম্প্রদায়কে নিশানা করে তৈরি হয়েছে—বিরোধীদের এমনই অভিযোগ। প্রস্তাবিত বিলটি অসরকারি হলেও সংসদে পাশ হলে তাকেও আইনের তকমা দেওয়া যায়। তাছাড়া জনৈক বিজেপি সাংসদ সংবিধান সংশোধনের জন্য আরও একটি অসরকারি বিল প্রস্তাব করেছেন।

প্রসঙ্গত, সংবিধান সংশোধন আগেও হয়েছে, কিন্তু এবারের প্রস্তাবে সংবিধান সংশোধনের নামে বদলের কথা বলা হচ্ছে, সংবিধানের সার্বভৌমত্ব সর্বজন স্বীকৃত হলেও, সংবিধান সকলের উপরে। এই সত্যটা স্বৈরাচারী দলের পক্ষে মানা মুস্কিল, তাই চেষ্টা চলছে সংশোধনের নামে যেন সংবিধানটাকেই ক্রমশ বদলে ফেলা যায়। উপরে উল্লিখিত প্রস্তাবিত বিলগুলিতে স্পষ্টই প্রতীয়মান সঙ্ঘ পরিবার এবার সরাসরি ময়দানে অবতীর্ণ। ইতিহাস সাক্ষী—রাষ্ট্র ক্ষমতায় ফ্যাসিবাদের আসন পাকাপোক্ত হওয়াটা সংসদীয় পথ বেয়েই হয়। ক্ষমতায় আসার পর ফ্যাসিবাদীরা সংসদকেই বিসর্জন দেয়, তার লক্ষণ আমরা ইতিমধ্যেই প্রত্যক্ষ করছি।

আর একটি বিষয়েও নজর দেওয়া প্রয়োজন। জনমানসে ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতির বিস্তার রোধ করতে হলে ফ্যাসিবাদ বিরোধিতায় ভারতের রাজনৈতিক দলগুলিকে আন্তরিক হতে হবে। দিল্লীর কৃষক আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের চেষ্টা চালাতে হবে। দ্বিতীয়ত, ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে মানুষকে সামিল করতে হলে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের স্বৈরাচারী পদক্ষেপ বিরোধী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যে দেউচা-পাঁচামিতে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে পরিবেশ দূষণকারী খোলামুখ খনি নির্মাণের বিরুদ্ধে, মানবাধিকার লঙ্ঘনের বহু ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনগুলিকে আরও জোরদার করা একান্ত প্রয়োজন—এই কাজটা ঠিকঠাক করতে না পারলে আখেরে ফ্যাসিবাদ বিরোধী লড়াইটাই রক্তশূন্য হয়ে পড়বে। স্বৈরাচার আর ফ্যাসিবাদের মধ্যে দূরত্ব কী খুব বেশি? রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা কী বলেন?

চিনকে উন্নয়নশীল দেশ বলা চলে কী?

বিশ্বব্যাঙ্কে এখনও চিনকে 'উন্নয়নশীল' দেশরূপে চিহ্নিত করা হলেও, এই বিষয়ে বহু রাষ্ট্র প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। চিন ছাড়াও আরও কয়েকটি দেশ (Upper middle income nations) উন্নয়নশীল দেশগুলির (Developing nation) জন্য সংরক্ষিত বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধাগুলি অনৈতিকভাবে ভোগ করছে—এমনই অভিযোগ। তাছাড়া সবচেয়ে কম উন্নত দেশ (Least Developed Countries) বলতে কি বোঝায়? সম্প্রতি বাংলাদেশের GDP ভারতকে ছাড়িয়ে যাওয়ায় বাংলাদেশও LDC র জন্য সংরক্ষিত বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কয়েকটি চুক্তি সংরক্ষিত Special and differential treatment (S & DT) এর সুবিধা ভোগ করছে। মজার বিষয়, WTO -র খাতায় উন্নত (Developed) এবং উন্নয়নশীল (Developing) দেশের বিশেষ কোনও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা না থাকায় বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সদস্য যে কোনও রাষ্ট্র মর্জি অনুযায়ী উন্নত (Developed) বা উন্নয়নশীল (Development) দেশরূপে ঘোষণা করতে কোনও অসুবিধা নেই।

তবে, চিনের মাথা পিছু আয় অনেক বেড়ে যাওয়াতে Upper Middle Class দেশরূপে চিহ্নিত হলেও এখনও উন্নয়নশীল দেশের সংরক্ষিত বিশেষ সুবিধা ভোগ করছে বলে প্রশ্ন উঠেছে এবং একাধিক রাষ্ট্রের দাবি চিনকে আর উন্নয়নশীল দেশরূপে চিহ্নিত করে উপরোক্ত বিশেষ সুবিধা দেওয়া চলবে না।

প্রসঙ্গত বর্তমানে চিনের মাথা পিছু আয় ১০,৪৩৫ ডলার তুলনায় ভারতের মাথা পিছু আয় ১,৯২৮ ডলার মাত্র।

এই বিতর্কে চিন অবশ্য বলেছে চিন এখন বিশ্বের বৃহত্তর অর্থনীতির দেশ, উন্নয়নশীল দেশের জন্য WTO সংরক্ষিত বিশেষ সুবিধাগুলির সুযোগ চিন আর ভোগ করবে না।

কোনও দেশের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুদ্ধের নিষ্ঠুরতম অস্ত্র বাণিজ্যিক অবরোধ

বিগত ছয় দশক ধরে নিরবচ্ছিন্ন বাণিজ্যিক অবরোধে আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত কিউবা, আক্রমণকারী উদার গণতন্ত্রের দেশ বলে অভিহিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। অবরোধের কারণ আমেরিকার নাকের ডগায় বসে থাকা এই দেশটির শাসনক্ষমতা এখনও কমিউনিস্ট পার্টির হাতে। এই লাগাতার বাণিজ্যিক অবরোধকে দুরারোগ্য ভাইরাস আক্রমণের সঙ্গে তুলনা করেছে কিউবা প্রশাসন। দীর্ঘ ৬০ বছরের এই বাণিজ্যিক অবরোধে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিউবার অর্থনীতি। আন্তর্জাতিক মহলও এই বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারিতে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির জমানায় কিউবার ওপর পরিপূর্ণ অবরোধ চালু হয়। ১৯৬০ সালে কিউবায় ক্ষমতাসীন ফিদেল কাস্ত্রোর সরকার কিউবার আমেরিকান তৈল শোধনাগারগুলিকে জাতীয়করণ করে। আখ ও সিগারেট শিল্পও জাতীয়করণ করা হয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের চোখে এ এক অমার্জনীয় অপরাধ। অতএব শাস্তি হিসাবে নেমে আসে অবরোধ। খাদ্য ও ওষুধ ছাড়া বাকি সব রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা চাপায় আমেরিকা।

বলা বাহুল্য, আমেরিকার মিত্র রাষ্ট্রগুলিও কমিউনিস্ট কিউবার বিরুদ্ধে এই নিষ্ঠুরতম অস্ত্রটি প্রয়োগ করতে দ্বিধা করে নি। ফলে আমেরিকা এবং আমেরিকার মিত্র বহু রাষ্ট্রের সঙ্গে কিউবার বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সেই সময় বিশ্ব মানচিত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন বলে এক দেশ ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য অধনতান্ত্রিক দেশগুলির অকৃপণ সাহায্য ও সহযোগিতায় কিউবা ততটা বিপাকে পড়েনি।

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং পূর্ব ইউরোপের অধনতান্ত্রিক শিবির ভেঙ্গে পড়ার পর কিউবার সঙ্কট প্রবল হয়ে ওঠে। ১৯৯২ সাল থেকে আমেরিকার অবরোধ তুলে নেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ বহুবার দাবি জানালেও কাজের কাজ কিছুই হয় নি। পাশ করানো হয়েছে বহু প্রস্তাব। কিন্তু আমেরিকা ও ইজরায়েলের বিরোধিতায় প্রস্তাবগুলি কার্যকর করানো যায়নি। বর্তমানে খাদ্যশস্য নিষেধাজ্ঞার আওতার বাইরে থাকলেও কিউবা ওষুধ সহ অন্যান্য বহু পণ্য আমদানি করতে পারে না।

গত ছয় দশকব্যাপী এই অবরোধে ছোট্ট রাষ্ট্র কিউবার মোট ক্ষতি হয়েছে ১৫ হাজার কোটি ডলার। কেমন করে এই তীব্র অর্থনৈতিক আক্রমণে কিউবা টিকে আছে ভাবলেও শিহরিত হতে হয়। কিউবার এখন মূল্য বৃদ্ধির হার ৭০ শতাংশ। দীর্ঘস্থায়ী অতিমারি এর উপর মারাত্মক আঘাত হেনেছে। কিউবার আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস পর্যটন শিল্প। করোনা আক্রমণের ফলে পর্যটন শিল্প বড় ধাক্কা খেয়েছে। ফলে কিউবার অর্থনীতি এখন এক গভীর সঙ্কটে। ৬০-এর দশক থেকে আমেরিকায় বহু প্রেসিডেন্ট এসেছে, বহু নীতির পরিবর্তন হলেও সমাজতান্ত্রিক এই দেশটির প্রতি অবরোধের নীতির কোনও পরিবর্তন হয়নি। এই অর্থনৈতিক অবরোধেও এক প্রকার 'ভাইরাস'। নানা কারণে পছন্দসই নয় এমন অনেক দেশের বিরুদ্ধে এই নিষ্ঠুরতম অস্ত্রটি প্রয়োগ করতে দ্বিধা করে না সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা। ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মতই সাম্রাজ্যবাদী অবরোধের বিরুদ্ধে দেশে দেশে আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন।

প্রতিবাদের পথে দেউচা পাঁচামি খনি প্রকল্পের বিরুদ্ধে

প্রতিবাদ আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হচ্ছে বীরভূমের দেউচা পাঁচামি খনি প্রকল্পের বিরুদ্ধে। ''বীরভূম জমি, জীবিকা ও প্রকৃতি বাঁচাও মহাসভা''র নেতৃত্বে ডেউচা পাঁচামি, হরিণশিঙা দেওয়ানগঞ্জ অঞ্চলের প্রস্তাবিত কয়লা খনি প্রকল্পের দাবিতে আগামি ২০ ফেব্রুয়ারি এক সভা আহুত হয়েছে। মহাসভা সব প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক শক্তি ও ব্যক্তিদের এই সভায় যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। কলকাতার প্রেস ক্লাবে আয়োজিত মহাসভার তরফ থেকে অভিযোগ জানানো হয়েছে রাজ্যশাসক ও শাসকদল গণতান্ত্রিক বিধির তোয়াক্কা না করে ওপর থেকে যা চাপিয়ে দিচ্ছে পুলিশ প্রশাসনকে দিয়ে তাই মানতে বাধ্য করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত খনি এলাকায় পাঁচ হাজারের বেশি পরিবার উচ্ছেদ হবে। এদের অধিকাংশই সংখ্যলঘু ও জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ, দলিত ও অনগ্রসর শ্রেণির মানুষও আছেন।

করোনা সংক্রমণ নিয়ে প্রতিরোধ বিধি নিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম দুনিয়ার হচ্ছেটা কী?

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ শিল্পে চিন সরকারের নীতি দুনিয়ার নজর আকর্ষণ করেছে। অতি কঠোর এই বিধি সম্ভবত মানবাধিকার লঙ্ঘনের সঙ্গেই তুলনীয়। গুরুত্বপূর্ণ এবং বৃহৎ অর্থনীতির দেশ চিন করোনা শূন্য নীতি থেকে এক চুল সরে আসতে নারাজ। ভিয়েতনাম সীমান্তের কাছে একটি শহরে সম্প্রতি মোট ৭০ জন করোনা আক্রান্ত ধরা পড়তেই ঐ শহরের ৩৫ লক্ষ বাসিন্দাকে বন্দি করা হয়েছে। সংবাদ সংস্থার এমনই খবর।

ইউরোপ-আমেরিকা আগেই ঘোষণা করেছে কোভিডকে সঙ্গে নিয়েই বাঁচতে হবে। চিনের ব্যাপার অবশ্য আলাদা। কিছু মানুষের কোভিড ধরা পড়লেই গোটা শহরকে গৃহবন্দি করা হচ্ছে। উপরন্তু করোনা সংক্রমণের ধারে কাছে এলেই দু'তিন সপ্তাহের জন্য ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে রাখা হচ্ছে। এখন গোটা চিনের দৈনিক সংক্রমণ ৭০-৮০র মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। উপরন্তু সারা দেশের জন্য করোনা শূন্যনীতি অনুযায়ী ফের লকডাউন শুরু হয়েছে কতকগুলি শহরে। প্রশাসনের তরফ থেকে বলা হয়েছে অপ্রয়োজনীয় গতিবিধি বরদাস্ত করা হবে না।

গত দু'বছরে লকডাউন, গণহারে কোভিড পরীক্ষা, দূরত্ববিধি, মাস্ক পরার মত নিয়ম কঠোরভাবে পালন করা হচ্ছে সারা দেশে, কোনও শহরে এক জনের করোনা সংক্রমণ ধরা পড়তেই সারা শহরে হইচই পড়ে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে গৃহবন্দী করে রাখছে চিন সরকার। তবে গত কয়েকমাস থেকে কোভিড সংক্রমণের হার উর্ধমুখী। এত কড়া নিয়ম পালনের পরেও কী করে করোনা সংক্রমণকে বাগে আনা যাচ্ছে না, বিশেষজ্ঞরা যে প্রশ্ন তুলেছেন, মানবাধিকার লঙ্ঘনের চরমতম দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও, পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে কী?

অপরদিকে করোনা বিধি পালনের সরকারি নির্দেশের প্রতিবাদে কানাডায় গণ আন্দোলন এমন পর্যায়ে উঠেছে প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো গণরোষের আগুন থেকে বাঁচতে সপরিবারে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছেন। ট্রাক চালকদের নেতৃত্বে পরিচালিত এই গণ আন্দোলনে রাজধানী অটোয়া জনজীবন কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায়। কানাডার সরকারি প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিচারবিভাগের হস্তক্ষেপ দাবি করেছে আন্দোলনকারীরা। কোভিড বিধি পালনের সরকারি কঠোর নির্দেশগুলির প্রতিবাদে অটোয়া ছাড়াও কানাডার অন্যান্য অঞ্চলেও এই প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়েছে।

কোভিড সংক্রমণের এই প্রতিবাদ আন্দোলন সুদূর অস্ট্রেলিয়ায়, নিউজিল্যান্ডের শহরগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছে বলে জানা গেল। শেষ খবর, প্রতিবাদ আন্দোলনের জেরে অটোয়ায় জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে।

বৈচিত্রময় এই দুনিয়ায় একদিকে (চিনে) করোনা অতিমারি প্রতিরোধ কল্পে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে লক্ষ লক্ষ মানুষকে গৃহবন্দী করা হচ্ছে, অপরদিকে পশ্চিম দুনিয়ার কোনও দেশে (কানাডা) করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনের জেরে প্রধানমন্ত্রীকে সপরিবারে আত্মগোপন করতে হচ্ছে।

শিক্ষার মৌলিক পুনর্গঠন ঃ কি এবং কেন

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

(১)

[কম. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ এ্যাডভান্সড স্টাডিজ, সিমলায় অনুষ্ঠিত একটি শিক্ষা সংক্রান্ত সেমিনারে এই ভাষণটি পাঠ করেন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং মার্কসবাদী তাত্ত্বিক কম. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের প্রবন্ধটি অর্ধশতাব্দী পরেও প্রাসঙ্গিক। তিনি এই আলোচনায় পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থার উপর গড়ে ওঠে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির উপরিকাঠামোর আন্তঃসম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার মৌলিক পুনর্গঠনের সমস্যা এবং সমস্যা সমাধানে বিকল্প দিগ্‌দর্শন সম্বন্ধে একটি মূল্যবান অন্বেষণের চিত্র উপস্থাপিত করেছেন। —সম্পাদকমণ্ডলী, গণবার্তা]

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদের লক্ষ্যে ঘটে চলা অভ্যুত্থান সমূহ শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের পরিসরে কয়েকটি ইতিবাচক বিকল্পের সন্ধান করেছে। নতুন ব্যবস্থায় শিক্ষাক্ষেত্রে এই ধরনের পদক্ষেপ ভবিষ্যতের নাগরিক সমাজকে নতুনভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অবশ্যই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়।

১৮৭১ সালের ক্ষণজীবী প্যারী কমিউন জন্মমুহূর্তেই পুরানো ব্যবস্থাটা ভেঙে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। মাত্র বাহাত্তর দিনের জীবনকালে সর্বজনীন শিক্ষাকে আবশ্যিক এবং কালিকলম বইপত্র সহ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয় বন্টনের দায়িত্ব প্রশাসনের উপর অর্পণ করা হয়েছিল। প্রতিটি কমিউনের উপর স্বশাসনের অধিকার অর্পণ করা হয়েছিল। যুক্তি এবং বিজ্ঞানভিত্তিক সর্বপ্রকার কুসংস্কার মুক্ত শিক্ষা। প্রচলিত সামাজিক সংস্কারগুলির অবসানের লক্ষ্যে মুক্তচিন্তার বিকাশ, সুস্থ নীতিবোধ, শ্রেণিসংগ্রাম এবং সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ, সামাজিক তথা রাজনৈতিক শিক্ষা বনাম অরাজনৈতিক তথা বদ্ধপরিবেশে শিশুদের শিক্ষাদানের অবসান ইত্যাদি মহান লক্ষ্য শিক্ষার মৌলিক দর্শন রূপে ঘোষিত হয়েছিল। নন্দনতত্ত্ব ও শিল্পকলার বহুমুখী বিকাশ, শিক্ষার সঙ্গে শিল্পায়নের কর্মসূচি হিসেবে মূল্য দেওয়া হয়েছিল। কমিউনের এডুকেশনাল কমিটি স্কুলগুলিতে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল, বিজ্ঞান এবং নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক শিক্ষার পরিপূর্ণ পাঠ্যসূচীর সঙ্গে তাদের অনুশীলনের ব্যবস্থা গ্রহণই হবে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য।

মার্কসের শিক্ষানীতি রুশ বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে। শিক্ষার সঙ্গে শিল্পায়নের সম্পর্কটি প্রথমেই মৌলিক বিষয়ের স্থান নিয়েছিল।

ঐতিহাসিক কারণে ১৯০৫ সালের রুশ গণতান্ত্রিক বিপ্লবে একটি অনন্যধারার সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিষয় সামনে এসে পড়েছিল। সেই বিপ্লবে ছাত্রসমাজ সাধারণ ধর্মঘট ও গণঅভ্যুত্থানে নিয়ন্ত্রক শক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। সংগ্রামের উত্থানপতন বিদ্যালয়সমূহে কোনো মৌলিক পরিবর্তনের পথ সাময়িক বন্ধ করে রেখেছিল।

রাশিয়ার ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর কয়েকটি ভবিষ্যতমুখী সাড়া জাগানো পরিবর্তন শিক্ষাক্ষেত্রে শুরু হয়েছিল। বিপ্লবের মাত্র চারদিনের মধ্যেই লেনিনের অনুপ্রেরণায় এ ভি লুনাচারস্কি শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠনের লক্ষ্যে একটি দীর্ঘস্থায়ী কর্মসূচির রূপরেখা তৈরি করেছিলেন। বলশেভিকরা এই মৌলিক পরিবর্তনের পক্ষে একটি বিস্তৃত সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক পরিসর হাতে পেয়েছিলেন। এঁরা প্যারী কমিউন এবং ১৯০৫-এর বিপ্লবের অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়ে, মার্কসবাদী চিন্তাবিদদের তত্ত্ব ও অনুশীলনের যুগপৎ পন্থা গ্রহণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে সারা বিশ্বের জ্ঞানী ঐতিহাসিক দার্শনিক সমাজতত্ত্ববিদদের মূল্যবান অভিজ্ঞতার আলোতে নিজেদের শিক্ষানীতিকে বলশেভিকরা সমৃদ্ধ করেছিলেন।

জার্মান, ফরাসী, ইংরেজী প্রভৃতি প্রতিটি ভাষা থেকে বিজ্ঞান অর্থনীতি সমাজতত্ত্ব রাশিয়ার ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। বিভিন্ন দেশ ও কালের অনুশীলন সমূহ কিভাবে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার শিক্ষানীতিতে দেশকালোপযোগী করে ব্যবহার করা যায় সেই বিষয়ের উপর সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

বলশেভিকরা ১৯১৭ সালের আগেই ১৯০৩ ও ১৯০৭ সালে তাঁদের শিক্ষানীতির রূপরেখা এঁকেছিলেন। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় সেই শিক্ষানীতি অনুসরণের শপথ নেওয়া হয়েছিল। অদ্ভুতভাবে প্যারী কমিউনের শিক্ষানীতির সঙ্গে এই শিক্ষানীতির সামঞ্জস্য দেখা যায়। 'বেসিক প্রিন্সিপলস অফ দি ইউনিফায়েড লেবার স্কুলের' ঘোষণার আগেই ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসেই এই সুসংবদ্ধ শিক্ষানীতি ঘোষিত হয়েছিল।

বিভিন্ন অপুঁজিবাদী দেশে সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তাতে এই ধরনের মৌলিক শিক্ষানীতি যে সামাজিক রূপান্তরের মূল্যবান হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি হাতে হাত ধরে এগিয়ে চলে এবং একে অপরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ক্ষমতাশীল স্বত্ব সম্পত্তির মালিক শ্রেণি শুধুমাত্র আর্থিক শোষণ ও রাজনৈতিক আধিপত্য দিয়েই ক্ষমতা বজায় রাখে না। এরা নিজেদের শ্রেণির স্বার্থবাহী সংস্কৃতি এবং শিক্ষাব্যবস্থা জানপ্রাণ দিয়ে টিকিয়ে রাখে শুধু নয়, সমস্ত সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে ক্রমাগত পুঁজিবাদী শিল্পব্যবস্থার পুনর্নির্মাণ করে চলে। অ-পুঁজিবাদী দেশে ঠিক বিপরীতটাই ঘটে থাকে, খেটেখাওয়া মানুষ নতুন শিল্প-সংস্কৃতিভিত্তিক উপরিকাঠামো নির্মাণের জন্য সদাসর্বদা প্রচেষ্টা করে। সুতরাং এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে মনে রাখতে হবে যে শিক্ষা কখনই অরাজনৈতিক বিষয় নয়। পরিপূর্ণভাবে আদর্শের ভিত্তিতেই কোনো সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

ভারতে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে ছিন্ন ও বিকৃত অবস্থার মধ্যে দেশের পুঁজিপতি শ্রেণির হাতে। এদেশের বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব তার ঐতিহাসিক গণতান্ত্রিক লক্ষ্যসাধনে ব্যর্থ বলেই অর্ধসমাপ্ত ছিন্নবিচ্ছিন্ন এই বিপ্লব। ঔপনিবেশিক অতীতের ঐতিহ্য আমরা আমূল উপরে ফেলতে পারিনি। সেই আমলাতান্ত্রিক তথা সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী সম্পত্তিসম্পর্ক নির্ভর পুলিশী-সেনাবাহিনী-আমলা সহ বিচারব্যবস্থা এখনও বহাল তবিয়তে টিকে আছে। আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমূল ঢেলে সাজানোর যে কর্মসূচি ঘোষিত হয়েছিল তা, রূপায়ণের স্বার্থে কোনো নতুন মৌলিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিকাঠামো কি স্বাধীন ভারতে আমরা গড়ে তুলতে পেরেছি? কার্যত আমরা এই লক্ষ্য সাধনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার অযৌক্তিক অবৈজ্ঞানিক উপাদন সমূহ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর তৃতীয় দশকেও আমরা শিক্ষাব্যবস্থায় বহন করতে বাধ্য হয়েছি।

(২)

১৯৪৮ সালে দেশের ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক নেতৃত্বের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব জওহরলাল নেহরু শিক্ষা সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, ''অতীতে শিক্ষা-সম্মেলনগুলিতে যখনই স্বাধীন ভারতের শিক্ষানীতি বিষয়ক আলোচনা উত্থাপিত হয়েছে, আমাদের প্রচলিত প্রবণতা ছিল যে, পুরানো ব্যবস্থাটাকেই প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করে আমরা শিক্ষানীতি প্রবর্তন করব। কিন্তু আজ আর তা চলবে না। দেশে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়েই নতুন শিক্ষানীতির প্রবর্তন করতে হবে। শিক্ষানীতির ভিত্তিটারই বিপ্লবী রূপান্তর আজ বর্তমান ভারতের লক্ষ্য।'' স্বাধীনতার দু'দশক অতিক্রান্ত হওয়ার পর শিক্ষাব্রতী জে পি নায়েক তাঁর শিক্ষাসংক্রান্ত গবেষণামূলক গ্রন্থে আক্ষেপ করেছেন, ''কি হয়েছে গত ষোল বছরে? শুধুমাত্র পুরানো শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোটাকেই কিছু প্রান্তিক সংশোধন এবং বিষয়ের বক্তব্যে সামান্য পরিবর্তন করেই আরো ব্যাপকতর পরিসরে প্রসার লাভ করানো হয়েছে।'' (এডুকেশন প্ল্যানিং ইন ইন্ডিয়া)।

প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতী ও চিন্তক নায়েকের বক্তব্যের তিক্ততা শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। কিন্তু অন্যরকম ফলাফল আশাও করা যায় না। আরো একজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ জ্ঞানচাঁদের বক্তব্য থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যাক, ''স্বাধীনতাউত্তরকালে আমাদের আর্থসামাজিক পরিকল্পনার বিকৃতি ও বিচ্যুতির স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে। একটি উন্নয়নশীল সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষার বিজ্ঞানভিত্তিক বিকাশ ও প্রসার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় উপাদান—সেই বিষয়টিই আমাদের সমস্ত পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অবহেলিত হয়েছে। একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজের সম্পূর্ণ মৌলিক শিক্ষার জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক তত্ত্ব ও অনুশীলনের প্রয়োগ, সমাজতান্ত্রিক আদর্শঋদ্ধ প্রযুক্তি ও প্রণালী এবং শিক্ষকসমাজেরও সমাজের সর্বজনীন উন্নয়নে ও পুনর্গঠনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার মতো প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ভীষণ প্রয়োজন ছিল। শিক্ষক সমাজের দায়বদ্ধতা, সৃজনশীলতা এবং নতুন সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিজেদের অনুশীলন ও ছাত্রসমাজকে শিক্ষিত না করতে পারলে শিক্ষার মৌলিক রূপান্তর সম্পূর্ণ ব্যর্থ। নবগঠিত এডুকেশন কমিশনে এই সব বিষয়গুলি আলোচনায় উঠে এসেছে। অনেকেই অস্বীকার করতে পারেন নি যে, শিক্ষাব্যবস্থার সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের লক্ষ্য এবং আদর্শ সম্বন্ধে একটি সম্যক ধারণা আমাদের শিক্ষা পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে এখনো গড়ে ওঠে নি।'' (সোসালিস্ট ট্রান্সফর্মেশন অফ ইন্ডিয়ান সোসাইটি—জ্ঞানচাঁদ)

(৩)

শিক্ষা কমিশন সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছে, শিক্ষার অর্থ শুধু দক্ষতা বৃদ্ধির জ্ঞান নয়, সমগ্র সমাজের মূল্যবোধ বদলানো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আধুনিকীকরণ বলতে কমিশন বোঝাতে চাইছে শিক্ষার লক্ষ্য 'সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লব'।

শিক্ষার আধুনিকীকরণ বিষয়টি এতই ধোঁয়াশাপূর্ণ বিষয় যে, সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে এই বিষয়টির মধ্যে যথেষ্ট ভিন্ন ধরনের ধারণা ও ব্যাখ্যা বর্তমান। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেন কখনো ভুলে না যাই যে, অপুঁজিবাদী সমাজে আধুনিকীকরণ এবং সমাজবাদী সমাজে আধুনিকীকরণের অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক। 'বিশুদ্ধ আধুনিকীকরণের' প্রবক্তা ব্যক্তিরা সমাজবিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিত ছাড়াই আধুনিকীকরণের ব্যাখ্যাতা। ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক গতির নিরিখে আধুনিকীকরণকে অবশ্যই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে হবে বলে আমরা মনে করি।

আমাদের দেশের আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াকে আমরা এভাবে দেখতে পারি। সংক্ষেপে অনেক অপুঁজিবাদী দেশে আমাদের তুলনায় দ্রুতগতিতে শিল্পায়ন ও আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া চলছে। কারণ এদেশে মিশ্র অর্থনীতি ভিত্তিক আধুনিকীকরণ প্রকৃতপক্ষে দেশের ধনিক শ্রেণির স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দ্রুত মুনাফা যারা শোষণ করছে তাদের উপর যথেষ্ট রাজস্ব ও করের চাপ না দিয়ে দেশের অধিকাংশ মানুষকে সর্বজনীন কল্যাণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এদেশের সমাজকাঠামোয় কয়েকটি বিশেষ জাতপাত সম্প্রদায়, ধর্ম ও ভাষাগত গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিরাই সুযোগসুবিধার সিংহভাগের অধিকারী।

এই প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে কিভাবে ভারতে আধুনিকীকরণ পুঁজিবাদী কাঠামোটাকে শক্তপোক্ত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে, তা বিশদ আলোচনার সুযোগ নেই। এই বিষয়টির প্রাসঙ্গিক কারণ শিক্ষাব্যবস্থাটা হল বৃহত্তর সামাজিক কাঠামোর অংশ বিশেষ এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই ভবিষ্যতের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের শিক্ষা দক্ষতা এবং সমাজে তাঁদের যোগ্যতা নিরূপিত হবে। সতীশ সাবরওয়াল ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলির, ১৯৭২ এর বার্ষিক সংখ্যায় যথার্থই লিখেছেন, ''আমাদের শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারের সমস্যা কখনই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুণমানের প্রেক্ষিতে দেখা উচিত নয়। সেই কারণেই ভারত সরকারের ২৪ জুলাই ১৯৬৮ তারিখে প্রকাশিত 'ন্যাশনাল এডুকেশনাল পলিসি রেজোলিউশনে' স্বীকার করা হয়েছিল 'শিক্ষার মৌলিক পুনর্গঠন' এবং 'শিক্ষা কাঠামোর মৌলিক রূপান্তর' এর জন্য প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রক্ষমতা ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ চরিত্র বিশ্লেষণ। প্রখ্যাত মার্কসবাদী ঐতিহাসিক ডি ডি কোশাম্বী, 'Excasperating Essays' গ্রন্থে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে স্বাধীনতাউত্তর ভারতে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে ভারতীয় শ্রেণির হাতে। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ, জনকল্যাণমূলক সমাজ, সমাজতান্ত্রিক স্বার্থে পরিকল্পনা কমিশন ইত্যাদি দেশবাসীর কাছে বিপণন করা হয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ এবং রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের শ্রেণিস্বার্থে। স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে দেশবাসী বিশেষ করে, শ্রমজীবী মানুষের কাছে যে সর্বজনীন উন্নয়নের লক্ষ্যে মুক্তির আহ্বান রাখা হয়েছিল তা গত পঁচিশ বছরে অলীক স্বপ্নে পরিণত হয়ে গিয়েছে।

ড. এ আর দেশাই তাঁর রিসেন্ট ট্রেন্ডস ইন ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম গ্রন্থে স্পষ্টভাবে ভারতীয় সংবিধানের বুর্জোয়া চরিত্র উন্মোচন করেছেন। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্র এই সংবিধানের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করছে।

দেশবাসীর মনে একটি সাধারণ ধারণা গড়ে উঠেছে যে, ক্ষমতাশীল কংগ্রেস নেতৃত্বের যথেষ্ট ত্রুটি থাকলেও একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্য যেন দায়বদ্ধ। যতই সত্য বলে একথা প্রতীয়মান হোক, মনে রাখতে হবে যে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র কোন অর্থেই সমাজতান্ত্রিক সমাজ বোঝায় না। পুঁজিবাদী শ্রেণি খুব ভালোভাবেই জানে যে, তাদের রাষ্ট্র পরিচালনার দক্ষতা নির্ভর করে কিছুটা সামাজিক পরিষেবা বন্টনের মাধ্যমেই। এই পরিষেবা বন্টনের সীমা যতটা সঙ্কুচিত করা যায়, সামাজিক পরিষেবার জন্য রাষ্ট্রের খরচ কতটা কমানো যায়, সেই দিকে শোষক শ্রেণির লক্ষ্য। এর জন্যই এদেশে ক্রমাগত শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি পরিষেবা কমিয়ে আনা হচ্ছে।

'দি কল' জুলাই '১৯৭২-এ প্রকাশিত

শেষ অংশ পরবর্তী সংখ্যায়

তৃণমূলের লুট-দুর্নীতি থেকে মুক্ত করুন পৌরসভাগুলিকে, আবেদন বামফ্রন্টের

পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র হত্যার উৎসব চলছে, আজ সশস্ত্র দুষ্কৃতীদের দাপাদাপি চলছে এই রাজ্যে গণতন্ত্রের বধ্যভূমিতে। গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষের সবথেকে বড় হাতিয়ার নির্বাচিত হওয়ার ও ভোট দেওয়ার অধিকার। সেই অধিকার আজ সশস্ত্র তৃণমূলী বাহিনী কেড়ে নিচ্ছে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন, সাধারণ প্রশাসন ও পুলিশের একাংশ এই কাজে ওদের সহযোগী অথবা নীরব। নিজের ভোট নিজে দিতে পারাটাই আজ এরাজ্যের মানুষের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ইতিমধ্যেই কয়েকটি পৌরসভায় তৃণমূল নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নে বাধা এবং প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করতে বাধ্য করে ৪টি পৌরসভার দখল নিয়েছে জোর করে। এই প্রেক্ষাপটেই আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের ১০৮টি পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের পৌরবাসীদের প্রতি রাজ্য বামফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ বলেছেন, বামফ্রন্ট সব অংশের মানুষের প্রতি আবেদন জানাচ্ছে— আপনারা সবাই ভোট দিন, নিজের ভোট নিজেই দিন। আপনাদের পাশে বামফ্রন্টের কর্মীরা থাকবেন।

বৃহস্পতিবার, ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত এই আবেদনে বামফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ বলেছেন, বিকল্প বামফ্রন্টই। এত অবাধ ভোট লুটের পরেও তাই বামফ্রন্টের ভোট বেড়েছে সব শহরেই আর কর্পোরেটে সংবাদমাধ্যমের হাওয়ায় ফোলানো বিজেপি বেলুন চুপসে গিয়েছে। বামফ্রন্টই এই রাজ্যে প্রকৃত বিকল্প—লড়াইয়ে, চিন্তায়, স্বচ্ছতায়, কাজে। তাই সর্বত্র বামফ্রন্ট মনোনীত ও সমর্থিত প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়ী করার আবেদন জানাচ্ছে রাজ্য বামফ্রন্ট। একইসঙ্গে যেখানে বামফ্রন্টের প্রার্থী নেই, সেখানে বিজেপি-তৃণমূলকে পরাস্ত করতে, ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক শক্তির প্রার্থীদের ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আবেদন জানাচ্ছে রাজ্য বামফ্রন্ট।

বিগত বামফ্রন্ট সরকার স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির বিকাশে ও উন্নয়নে যে বিকল্প পথ নিয়েছিল, তা উল্লেখ করে আবেদনে বলা হয়েছে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ১৯৭৭ সালে শপথ নিয়েই বলেছিলেন, আমাদের সরকার মহাকরণ থেকে চলবে না। পঞ্চায়েত পৌরসভা ইত্যাদি নির্বাচিত সংস্থার ৬০ হাজারেরও বেশি জনপ্রতিনিধিরাই আমাদের সরকার চালাবেন। এটাই হলো মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকার পরিচালনা করা। পরবর্তীতে শুধু কাউন্সিলর বা পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের হাতেই সব ক্ষমত নয়, শহরে 'ওয়ার্ড কমিটি' ও গ্রামে 'গ্রাম সংসদ' তৈরি করে বিরোধী দল সহ সব অংশের মানুষের মতামতের ভিত্তিতেই পৌরসভা ও পঞ্চায়েত পরিচালনা করার বাধ্যতামূলক আইনও তৈরি করে বামফ্রন্ট সরকার। এই নজির ভারতের কোথাও সেই সময়ে ছিল না। বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছরে পৌরসভা বা কর্পোরেশন বা গ্রামের পঞ্চায়েতগুলির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও নির্বাচন হয়নি, এমন একটা উদাহরণও দেখাতে পারবেন না কেউ।

স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলি পরিচালনায় গণতন্ত্র, বিরোধী দলের ভূমিকা ও ভোট লুটের বিষয় উল্লেখ করে এই আবেদনে বলা হয়েছে, বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে অনেক কর্পোরেশন, পৌরসভা বা পঞ্চায়েত পরিচালনা করেছে বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দল। কিন্তু বিরোধী দল জিতেছে বলে কোনও বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ বিরোধী দলগুলিও তুলতে পারেনি। বিরোধীরা জিতে যেতে পারে, তাই নির্বাচন অগণতান্ত্রিক ভাবে বন্ধ করে রাখা বা পুলিশ-প্রশাসন-দুষ্কৃতীদের ব্যবহার করে অবাধ ভোট লুটের ব্যবস্থাও করেনি বামফ্রন্ট, যা তৃণমূলের আমলে প্রতিটি নির্বাচনে ঘটে চলেছে। বামফ্রন্ট সরকার পৌরসভা নির্বাচনে দেশের মধ্যে প্রথম ১৮ বছর বয়সে ভোটাধিকার দিয়েছিল। তৃণমূল সরকারে এসে সব মানুষের ভোট দেওয়ার অধিকারই কেড়ে নিচ্ছে।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে আবদনে বলা হয়েছে, বামফ্রন্ট সরকার রাজ্য নির্বাচন কমিশনের হাতে নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পরিচালনা করার চূড়ান্ত অধিকার ও ক্ষমতা দিয়েছিল। তৃণমূলের সরকারের সময়ে এক জন নির্বাচন কমিশনারকে সরকারের বিরুদ্ধে আদালতের কাছে বিচার চাইতে যেতে হয়েছিল। আর এক জন কমিশনারকে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। বর্তমানে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে সরকারের আজ্ঞাবাহকে পরিণত করা হয়েছে।

উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করে আবেদনে বলা হয়েছে, যে কোনও শহরের উন্নয়ন মানে যেমন একদিকে রাস্তাঘাট-নিকাশী-পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, অন্যদিকে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাও পৌর উন্নয়নের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বর্তমানে পৌরসভাগুলোতে শূন্যপদের সংখ্যা ৪২ হাজার ৩১৪। বামফ্রন্ট বোর্ড গঠন করলে শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগের জন্য সচেষ্ট হবে। অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের প্রাপ্য অর্থ এবং পেনশনও দিতে পারছে না তৃণমূল সরকার ও তাদের পরিচালিত অনেকগুলি পৌরসভা। বামফ্রন্ট বোর্ড গঠন করলে সব কর্মীকে কাজের নিরাপত্তা ও অবসরকালীন সুবিধা দেবে।

বামফ্রন্ট পরিচালিত পৌরসভাগুলির সময়ে গড়ে ওঠা অসংখ্য মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অস্তিত্ব নেই বেশিরভাগ পৌরসভায়। যেগুলো আছে, সেখানে চূড়ান্ত দলবাজি বা দুর্নীতি চলছে। বামফ্রন্টের সময়ে তৈরি প্রকল্প, বেকার যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের শেষে ঋণদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে তোলার কাজ কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে তৃণমূল। বামফ্রন্ট বোর্ড গঠন করলে আবার দলবাজি ও দুর্নীতিমুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তুলবে ও বেকারদের জন্য স্বনিযুক্তি প্রকল্প চালু করবে।

বামফ্রন্টের আমলে শহরের বস্তি ও বস্তিবাসীদের উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হতো। গরিব শ্রমজীবী মানুষের জন্য পৌর স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তুলেছিল বামফ্রন্ট পরিচালিত পৌরবোর্ডগুলো। বহু পৌরসভায় তৃণমূল এসে হয় এগুলো প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে বা বেসরকারি হাতে তুলে দিয়েছে। ফলে শহরের গরিব মানুষের চিকিৎসার কাজ চরমভাবে অবহেলিত হচ্ছে। কোভিড টিকা নিয়ে পর্যন্ত চূড়ান্ত দলবাজি ও জালিয়াতি করেছে তৃণমূল। এদের ফিরে আসা রুখতেই হবে। বামফ্রন্ট বস্তিগুলির উন্নয়নের জন্য পৃথকভাবে অর্থ বরাদ্দ করবে।

অবাধ চুরি, দুর্নীতিই হলো তৃণমূল দলের নীতি। মানুষের করের টাকার এই লুট চলতে দেওয়া যায় না। এই দুর্নীতির অবসান ঘটাতেই হবে। বামফ্রন্ট বোর্ড গঠন করলে পৌরসভাগুলোকে দুর্নীতিমুক্ত করবে। বেআইনি পুকুর ভরাট, গাছ কাটা বন্ধ করবে। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকবে।

কোভিড পরিস্থিতির মোকাবিলায় আক্রান্ত মানুষের পাশে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দাঁড়িয়েছে বামপন্থী দলগুলির কর্মীরা বিশেষত, রেড ভলান্টিয়াররা রাজ্য জুড়েই। 'দিন আনি দিন খাই' গরিব মানুষের জন্য মাসের পর মাস শ্রমজীবী ক্যান্টিন-বাজার চালিয়েছে বামপন্থী রেড ভলান্টিয়ার বাহিনী। এই সময়কালে প্রাণের ভয়ে কোটি কোটি টাকার মালিক শাসক দলের সাংসদ, বিধায়ক, কাউন্সিলরদের অনেকেই নিজেদের বাড়ির দরজায় খিল আটকে লুকিয়ে ছিলেন। এরা করবেন উন্নয়ন? তৃণমূলের লুট-দুর্নীতি-পরিবেশ ধ্বংস করার থেকে মুক্ত করতেই হবে রাজ্যের পৌরসভাগুলোকে। সিন্ডিকেট রাজ-তোলাবাজদের হাতে ছেড়ে রাখা যায় না রাজ্যের এতগুলো শহরকে।

ভারতের সাধারণ জনজীবন মোদি-শাহ'র অপশাসনে বিপর্যস্ত

১-এর পাতার পর

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলছে প্রতিনিয়ত। আদিত্যনাথের পরাজয় সম্ভবত অনিবার্য হয়ে পড়েছে। তিনি সরাসরি তাঁর জঘন্য সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রচার করে চলেছেন। তিনিই নির্ধারণ করেছেন উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনী লড়াই ৮০ শতাংশের সঙ্গে ২০ শতাংশের। আশঙ্কা হয় যে, মোদি, শাহ, যোগী প্রমুখকে শাসনক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করতে পারলেও যে বিষাক্ত সামাজিক সংস্কৃতি ইতিমধ্যেই নির্মিত হয়েছে তা থেকে মুক্তি প্রায় অসম্ভব। সমাজ সংস্কৃতির অনপনেয় ক্ষতি থেকে দেশের জনসমাজকে বাঁচাতে গেলে ভাবাদর্শগত যে দীর্ঘস্থায়ী লড়াই প্রয়োজন তা, বুর্জোয়া দলগুলি করতে প্রস্তুত নয়।

উত্তরপ্রদেশে ভোটগ্রহণ চলেছে ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে, চলবে দীর্ঘ প্রায় একমাস। গণনা—১০ মার্চ। দুটি পর্যায়ের ভোটগ্রহণ ইতোমধ্যেই শেষ। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, জাঠ সম্প্রদায়ের প্রাধান্য। কৃষক আন্দোলনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিল এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের। ২০১৭'র নির্বাচনে এই অঞ্চলে বিজেপি'র নিরঙ্কুশ প্রাধান্য ছিল। বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মোদির ঘনিষ্ঠতম স্যাঙাৎ অমিত শাহ স্বয়ং দায়িত্বে। তাঁর প্ররোচনায় মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে জাঠদের সাম্প্রদায়িক হানাহানি। জাতি বিদ্বেষের ওপর ভর করে বিজেপির বাজিমাৎ। এবার সেই অবস্থা আদৌ নেই। ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের দুকূলপ্লাবী অভিঘাতে আগের মতো সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস বিলকুল বন্ধ। অমিত শাহ'র ঘুম ছুটেছে। ঘাম ঝরছে অবিরাম। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এটা এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ভোটের ফলাফল, অনেকের মতে বিজেপি'র বিরুদ্ধে যাচ্ছে বলে ধারণা।

সংখ্যালঘু ভোট নির্দিষ্টভাবে বিজেপি প্রার্থীরা পাচ্ছেন না। অনেক পর্যবেক্ষক মনে করছেন যে, সাহারানপুর, আমরোহা, আজমগড়, মোরাদাবাদ, রামপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বিজেপি'র আসন সংখ্যা প্রভূত সংখ্যায় কমে যাবে। মধ্য এবং পূর্ব উত্তরপ্রদেশে এই ক্ষয় পূরণ করে গত নির্বাচনে যে ফলাফল বিজেপি'র পক্ষে গিয়েছিল, এবারে তা হবে না। প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর নিজের পদমর্যাদা বিস্মৃত হয়ে উন্মত্তের মতো আচরণ করছেন।

পাঞ্জাব রাজ্যের ৭০টি আসনে বিজেপি বিশেষ স্বস্তিতে নেই। প্রধানমন্ত্রী হঠাৎ কৃষক আন্দোলনের সমর্থক হয়ে পড়েছেন। তিনি অদ্ভুতভাবে অভিযোগ করছেন যে, পাঞ্জাবের কংগ্রেস সরকার আন্দোলনকারী কৃষকদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। তাঁদের আন্দোলনে বাধাসৃষ্টি করেছিল।

বিনাশ কালে বুদ্ধিনাশ। দেশের সবাই জানেন যে, বিশেষ করে নরেন্দ্র মোদির একগুঁয়েমিতেই আদানি-আম্বানির কৃষিপণ্য ব্যবসাকে সাহায্য করতেই তিনটি কৃষক বিরোধী আইন জোর করে লোকসভায় পাশ করানো হয়েছিল। বহু রক্তপাত। কেন্দ্রীয় সরকার ও হরিয়ানা সরকারের পুলিশ অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়েছিল। তারা পারেনি কৃষক আন্দোলন স্তব্ধ করতে। দীর্ঘ এক বছরের আন্দোলনে প্রায় সাতশো জন কৃষকের মৃত্যু হয়। চরম অত্যাচারের মুখে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল ছোট বড় মাঝারি কৃষকদের অদম্য আন্দোলন। কেন্দ্রীয় সরকার জেদ করে যুক্তিহীন আচরণ করে গেছে। অবশেষে মোদি সমগ্র জাতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনার নাটক করে কৃষি আইন প্রত্যাহারে বাধ্য হয়েছিলেন। এখন বেগতিক দেখে উল্টে অন্যের ওপর দায় চাপিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় রত মোদি ও বিজেপি নেতৃত্ব। কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। ওইসব অঞ্চলের মানুষ এককাট্টা হয়ে সমস্ত প্ররোচনার যথাযোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত। এমন এক বিপর্যস্ত আর্থ-রাজনৈতিক দুরবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পেতে বাম দলগুলির ঐক্যবদ্ধ অবস্থান দেশের মানুষ আশা করে। এ প্রসঙ্গে দুঃখজনকভাবেই সেই ভূমিকা অনুপস্থিত।

পশ্চিমী দুনিয়ায় আশঙ্কা যে কোন মুহূর্তে রাশিয়া লক্ষাধিক সেনা নিয়ে ইউক্রেন আক্রমণ করতে পারে

এই মুহূর্তে উত্তেজনার পারদ চরম মাত্রায়। পশ্চিমী দুনিয়ার আশঙ্কা, যে কোন মুহূর্তে ইউক্রেন আক্রান্ত হতে পারে। আক্রমণকারী রাশিয়া। সন্দেহ নেই, এই আক্রমণ ইউরোপের মাটিতে এক মহা বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। সঙ্কট মোচনের পথের সন্ধানে ফরাসী প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাঁকরোকে মস্কোতে ছুটে আসতে হয়েছে এবং জার্মান চ্যান্সেলর ওল্‌ফ স্কলজ উড়ে গেছেন ওয়াশিংটনে। রাশিয়ায় সম্ভাব্য ইউক্রেন আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আমেরিকা এবং পশ্চিম দুনিয়ার যৌথ উদ্যোগের পথের সন্ধানের জন্যই এত দৌড়ঝাঁপ।

ইউক্রেন সীমান্তে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ সরঞ্জাম নিয়ে রাশিয়ার লক্ষাধিক সেনা সমাবেশে পশ্চিমী দুনিয়ার আশঙ্কা আসন্ন রাশিয়ার ইউক্রেন অভিযান। হোয়াইট হাউসের নিরাপত্তা উপদেষ্টার সতর্কবাণী—যে কোনও দিন রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ ঘটলে মানবসমাজ বিপুল ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে পড়বে। চরম মূল্য দিতে হবে বিশ্ববাসীকে।

রাশিয়া অবশ্য ইউক্রেন আক্রমণের কোনও পরিকল্পনার কথা অস্বীকার করছে, পাশাপাশি রাশিয়ার দাবি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্র দেশগুলির ইউক্রেন এবং অন্যান্য প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের কয়েকটি রাষ্ট্রের 'ন্যাটো' তে যোগ দেওয়া বন্ধ করতে হবে, ন্যাটোকে বাহিনী সৈন্য সামন্ত ও যুদ্ধ সরঞ্জাম সহ পূর্ব ইউরোপের মাটি থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। ওয়াশিংটন এবং ন্যাটো রাশিয়ার দাবি সরাসরি নাকচ করেছে। ম্যাঁকরো রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনকে পশ্চিমের দেশগুলির সঙ্গে আলোচনা টেবিলে বসার জন্য অনুরোধে করেছেন। দ্বিপাক্ষিক আলোচনাই সঙ্কট নিরসনের একমাত্র পথ। এমন কথাই বললেন ইম্যানুয়েল ম্যাঁকরো। সমস্ত বিতর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে পুতিনের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনায় ম্যাঁকরো আশাবাদী। ম্যাঁকরোর উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন ভ্লাদিমির পুতিন। উচ্চ পর্যায়ের এই কূটনৈতিক উদ্যোগের অংশ হিসাবেই জার্মান চ্যান্সেলর ওলফ স্কলজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। ক্রেমলিন সফর শেষে প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাঁকরো ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে এসেছেন। প্রতিমুহূর্ত ইউক্রেন আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনেস্কির সঙ্গে ম্যাঁকরোর আলাপ আলোচনা চলছে। রাশিয়া তার ইতিপূর্বে উল্লেখিত দাবি থেকে স্বাভাবিক কারণেই সরে আসতে তৈরি নয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অবশ্য অদূর ভবিষ্যতে ইউক্রেনের ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছেন।

ইউক্রেন সঙ্কট নিয়ে বর্ণিত পরিস্থিতির যে কোনও মুহূর্তে পরিবর্তন হতে পারে তবুও সঙ্কটের পটভূমি হিসাবে এই আলোচনা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ভারতের কথা : মোদির উত্থানের পশ্চাদপট

মনোজ ভট্টাচার্য

এর প্রারম্ভ তো বেশ অনেককাল আগে। দেখতে দেখতে দীর্ঘ তিন দশককাল পেরিয়ে চারের দিকে যাত্রা। সেই সময় তো শতকোত্তীর্ণ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের শেষ সরকার। তার পরবর্তীকাল তো সব মিলিজুলি শাসন। সেই শেষ সরকারও তো সংখ্যা লঘিষ্ঠের যাতনায় সদা ত্রস্ত। কেন্দ্রীয় স্তরে রাজনীতির পরিপক্কতা নিয়ে তাঁর নানা সময়ের কূটকৌশল বেশ লক্ষণীয় ছিল। দৈনন্দিন আলোচনা বিতর্ক চলতো রাজনীতির নানা স্তরে। সেই সরকারের প্রধান নরসিমহা রাও। দক্ষিণী ব্রাহ্মণ। শিক্ষিত ও অনুশীলনে বেশ পোক্ত। শ্রীপেরুমপুদুরে তাঁর পূর্বসূরী এবং তৎকালীন কংগ্রেস দলের মূল সত্বাধিকারী রাজীব গান্ধির নির্মম হত্যা। শ্রীলংকার উগ্র তামিল জাতীয়তাবাদের আফিমে বুঁদ হয়ে থাকা কতিপয় আত্ম-নিধনকারী উন্মত্ত গোষ্ঠীর আত্মঘাতী বীভৎস বিস্ফোরণ। সভাস্থলে অভ্যর্থনার ছলে। সে বড়োই হৃদয় বিদারক। মুহূর্তমাত্র সময়ে দেশের এই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর দেহ ছিন্নবচ্ছিন্ন। সেই সময়ে সাধারণ নির্বাচনের জোরালো প্রচার চলছে। মর্মান্তিক এমন মৃত্যুর অভিঘাতে ভোটের বাক্সে কিন্তু সেই উদ্বেল ঢল নামে নি।

রাজীব জননীও কোন উগ্র জাতীয়তাবাদ বা খণ্ড-জাতীয়তাবাদের সাধকদের অন্ধ আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। সেই অঘটন ঘটেছিল ১৯৮৪র ৩১ অক্টোবর। তার অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধির চিতার আগুন বহু ভারতবাসীর অশ্রুতে পরিণত হয়েছিল। নির্বাচনে রাজীব গান্ধির কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেই সরকার তৎকালে অপরিপক্ক রাজীব গান্ধি বন্ধু ও বয়স্য নির্ভর হয়ে কেন্দ্রীয় প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত হলেন। সংসদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে সরকার চলেছিল বস্তুত শাসকদলের একান্ত ইচ্ছাপূরণে প্রবৃত্ত হয়েই।

পণ্ডিত নেহরুর আদরের নাতি এবং একদা দোর্দন্ডপ্রতাপ ইন্দিরা তনয় রাজীব গান্ধি ভারতের মতো এক পশ্চাদপদ দেশকে এক লাফে একবিংশ শতকে পৌঁছে দেবার অভিপ্রায়ে দেশের অর্থনীতি ও সংস্কৃতিকে ঢেলে সাজানোর প্রক্রিয়া চালালেন বিপুল বেগে। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বালাই ছিল না। তাঁর ঘনিষ্ঠ বলয়ে স্থিত ব্যক্তিদের বাসনাই সব। এই সুযোগে দেশের কতিপয় সম্পত্তিবান ব্যক্তির অঢেল সুবিধা অর্জনের লিপ্সা উন্মত্ততায় পরিণত। একদিকে বিপুল পরিমাণে বিদেশি দ্রব্য আমদানি ও এমন সব পণ্য অবাধে ভারতে আমদানি যা, দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির বিকাশে তেমন কোনো তাৎপর্যই বহন করে না। ভারতের বড়োলোকের বিদেশি স্যাঙাৎদের সমমানের জীবনযাত্রা সম্ভব করার জন্য বহু লক্ষ ডলার বিদেশি মুদ্রা ব্যয় করে ইতালির সুদৃশ্য মার্বেল নানা বাথরুম ফিটিংস প্রভৃতি আমদানি করা হয়। সেসবের ব্যবহারে সম্পত্তিবানদের স্নানঘরকে বিলাসিতার পরাকাষ্ঠা উপভোগে সাজানো হয়েছিল। বিপুল সংখ্যায় আলু ভাজার যন্ত্র চলে আসে ভারতে। আঙ্কল চিপস্। এমন ধরনের বিভিন্ন পণ্য আমদানি হয়তো স্বল্পসংখ্যক বিত্তবানের ঐশ্বর্য-বিলাসিতা-বাসনা পূরণ করেছিল। ঐশ্বর্যের বিকার দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জীবনের বিপরীতে। ভারতের বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় কিন্তু বাস্তবে এসবের ফলে তলানিতে ঠেকে।

এসব প্রসঙ্গ সেই সময়কালে দৈনিক সংবাদ মাধ্যমে বিশেষ সোরগোল তুলেছিল। এছাড়াও ১৯৮১-৮২ আর্থিক বর্ষে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল কিংবা আই এম এফ-এর মতো আন্তর্জাতিক স্তরে লগ্নিপুঁজির কারবার করার সংস্থাগুলির কাছ থেকে বিপুল পরিমাণে ঋণ নেবার বন্দোবস্ত করেন ইন্দিরা গান্ধির সেই জমানার অর্থমন্ত্রী আর ভেঙ্কটরামন। আই এম এফ-এর শর্ত কণ্টকিত ঋণ ভারতের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির সর্বজনীন উন্নয়নে কোনো তাৎপর্যই বহন করে না। এই ঋণের অংশবিশেষ গ্রহণ করার পরেই ইন্দিরা গান্ধি সচকিত হয়ে পড়েন। সম্ভবত আতঙ্কিত হয়েই বাকী অধিকার আর প্রয়োগ করেন নি। এই বিপুল ঋণের কঠিন শর্তাবলি নিয়ে এন রামের মতো বিশিষ্ট সাংবাদিক ওয়াশিংটনে বসে গভীর তদন্তমূলক প্রতিবেদনের মাধ্যমে রহস্য উন্মোচন করে দেখিয়ে দেন যে, কী ভয়ানক সমস্যায় ভারত পড়ছে বা পড়তে চলেছে। এন রামের এই অন্তর্তদন্তমূলক সাংবাদিকতা এক সুউচ্চ আদর্শবোধের পরিচায়ক। সেই সময়কালে অবশ্য বর্তমানকালের মতো গণমাধ্যমে কর্পোরেট কোম্পানিগুলির নিশ্ছিদ্র আধিপত্য নির্মিত হয়নি। বিকৃতির পূর্ণপ্রকাশ এমন ঘোর মিথ্যার প্রসার ঘটায় নি। এতো এক ফেনোমেনন!

অনেকেরই স্মরণে আছে যে, বিশিষ্ট বামপন্থী সাংসদ ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা অরুণ কুমার রায় লোকসভায় বক্তৃতা করে টেন কম্যান্ডমেন্টস-এর সঙ্গে মিলিয়ে শর্তগুলির বিবরণ দিয়েছিলেন। প্রায় সেই বাইবেল ঘরানার ভাষা ব্যবহার করেই তিনি এক অসাধারণ বক্তব্য পেশ করে সমগ্র জাতিকে সচকিত করেছিলেন। অর্থমন্ত্রী ভেঙ্কটরামন পরিহাসচ্ছলে দাবি করেছিলেন যে, তিনি এক অসাধারণ কাজ করছেন। তাঁকে সংসদে ধন্যবাদ জানানোর পরিবর্তে কেন যে সমালোচনা করা হচ্ছে তা বোধগম্য নয়। পরবর্তী ইতিহাস এসব কথাকে ভুল প্রতিপন্ন করেছে।

অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে, রাজীব গান্ধির প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। তিনি যাঁদের ওপর নির্ভর করেছিলেন, তাঁরাও যোগ্যতা প্রমাণের পরিবর্তে আনুগত্য প্রকাশ ও স্তাবকতা করতেই বেশি যত্নশীল ছিলেন। তার সঙ্গেই যুক্ত হয়েছিল আই এম এফ-এর ঋণের শর্তাবলি। আংশিক হলেও সেসব শর্তের পরিপূরণ অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক বিকাশকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। এই ইতিহাস ইদানিং আর বহু চর্চিত নয়। কিন্তু বর্তমানকালে দেশে প্রচলিত যে অনপনেয় সমস্যা উদ্ভূত হয়েছে তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে কিঞ্চিৎ অতীত ইতিহাস চর্চা জরুরি। নরেন্দ্র মোদির মতো এক চরম অমানবিক স্বৈরতন্ত্রী কী আচমকা গজিয়ে উঠেছেন, না এই উত্থানের পিছনে অনেকেরই ভূমিকা ছিল। কোথাও শাসকের অবিমৃশ্যকারিতা আবার কোথাও ভ্রান্ত রাজনীতিবোধ বিগত শতকের কুড়ি বা ত্রিশ দশকের জার্মানীর পটপ্রেক্ষায় যেমন হিটলারের মতো এক দানবীয় রাজনীতিকের উত্থান সম্ভব হয়েছিল, তার যেমন বিচ্ছিন্ন ব্যাখ্যা বিজ্ঞানসম্মত নয়, এ দেশেও তা-ই।

ইতিহাস ভুলে গেলে—ভুলের ফাঁদে বারংবার

প্রত্যক্ষ সাম্রাজিক নিগড়মুক্ত ভারত শাসনে একটি পর্যায়ে নেহরু তনয়ার আবির্ভাব। তিনি দিল্লির রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিন্দে আগেই স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছিলেন। এদেশে গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী বলবৎ রাখায় পণ্ডিত নেহরুর বিশেষ উদ্যোগ অবহেলার নয়। আবার সেই ইমারতকে ধূলিমলিন করার কৃতিত্বও তাঁর উত্তরসূরী ইন্দিরা গান্ধির। তাঁর শাসনকালেই তো ২৫ জুন ১৯৭৫ -এ গণতন্ত্রের শেলস্বরূপ আপৎকালীন ব্যবস্থার ঘোষণা। বস্তুত, এক ব্যক্তির সর্বাধিনায়িকা থাকার উদগ্র লিপ্সার যূপকাষ্ঠে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৌলিক অধিকার খান খান। বিশসূত্রী কর্মসূচি বহিরাবরণে যাই থাকুক—আসলে তা, দিল্লিশ্বরীর অনুগত এবং বিশ্বাসভাজন কতিপয় পরিবার বা ব্যক্তির ধনার্জন আকুতিকে আরও বিস্ফারিত করেছিল। এইসব পুঁজিমালিকরা একান্তভাবেই কেন্দ্রীয় স্তরের আমলাতান্ত্রিক সিদ্ধান্তগুলির অন্যায্য সুবিধা অর্জন করেই গজিয়ে উঠেছিল। দিল্লি-উপকণ্ঠ, গাজিয়াবাদ-ফরিদাবাদ- গুরগাঁও প্রভৃতি অঞ্চলে শিল্প কারখানার বিকৃত বিস্তার ঘটেছিল। ইন্দিরা শাসনের পৃষ্ঠপোষক ছিল তারাই। আর সরকারিভাবে ১৯৭৬ থেকেই প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ভারতে 'ইমপোর্ট লিবেরালাইজেশন' বা অবাধ আমদানির শুরুয়াত। ইন্দিরা ও সঞ্জয় গান্ধির দৌলতে এ হেন শিল্পবিপ্লবের বিকৃত বিকাশে উদার-আমদানি বিশেষ ফলদায়ক হয়েছিল।

রাজীব জমানায় সেই উদারতা আরও বিপুল বেগে চলে। দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির যথাযথ উন্নয়ন সম্ভব না করে তিনি মাতৃ ঐতিহ্যই বাস্তবে অনুসরণ করেন। রপ্তানি তলানিতে আর আমদানি বেড়ে চলল দুরন্ত গতিতে। এমনকি, আই এম এফ ঋণের শর্ত পূরণে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের বিশেষ হস্তক্ষেপে ওয়েস্টল্যান্ড হেলিকপ্টার ভারতে চলে আসে। দুনিয়াজুড়ে অচল প্রতিপন্ন হওয়া এই প্রযুক্তিগত ত্রুটিযুক্ত হেলিকপ্টার একাধিক সংখ্যায় বিশেষ দামে কেনা হয়। এখনও মনে পড়ে, শুধুমাত্র দেশের বিদেশি মুদ্রার অবিমৃশ্যকারি সমস্যা সৃষ্টিই নয়, এমন সব হেলিকপ্টারগুলি ও এন জি সি'র মতো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার অনেক কৃতবিদ্য বিজ্ঞানীর মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। বম্বে হাই-এ জ্বালানি তেলের অনুসন্ধান ও উত্তোলনে এই আকাশযান ব্যবহৃত হয়েছিল। পর্যটন শিল্পেও ব্যবহারের নির্দেশ ছিল। এই আকাশযানগুলি পত পত করে উড়তো আর দুমদাম ভেঙে পড়তো। অতীব দুঃখজনক সেসব ঘটনাবলী।

ইন্দিরা জমানার শেষদিকে এবং রাজীব জমানার প্রায় মাঝামাঝি সময়ে ১৯৮৭-৮৮ সালে দেশের অনেক অর্থনীতিবিদ অভ্যন্তরীণ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক অনাচার ও ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করেছেন। নরেন্দ্র মোদীর অপশাসনকালে এমনসব শুভচিন্তক বা অর্থনীতিশাস্ত্রীদের বিরুদ্ধে অবশ্যই দেশদ্রোহিতার অভিযোগ উত্থাপিত হোত। নিদেনপক্ষে এন আই এ বা ইউ এ পি এ-র মতো দানবীয় আইন প্রয়োগ করে সেইসব ব্যক্তিদের দেশের কোন না কোনও কারাগারে বন্দি করা হোত। রাজীব জমানায় সভ্যতার প্রাথমিক শর্তাবলী ধ্বংস করার মতো এমন কোন অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত প্রায় প্রযুক্ত হয় নি, বলা যায়। অবিমৃশ্যকারিতা থাকলেও অবমনুষ্যত্বের কোনও প্রকাশ ছিল না। পেশায় বিমানচালক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে উদাসীন রাজীব গান্ধি তৎকালীন পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতা বা পারিবারিক শাসন বলবৎ রাখার জন্যই প্রধানমন্ত্রীর গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। শোনা যায়, ব্যক্তিগতভাবে তাঁর তেমন উচ্চাশা ছিল না।

তৎকালীন সময়ে ভারতের সংবিধানসম্মত সংস্থাগুলির স্বাতন্ত্র ও সার্বভৌমত্ব বর্তমানকালের মতো জলাঞ্জলি দেওয়া হয়নি। ভারতের শীর্ষ ব্যাঙ্ক বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শীর্ষপদে কৃতবিদ্য অর্থনীতিশাস্ত্রীরাই অভিষিক্ত হতেন। এখনকার মতো ইতিহাস-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী কোনও আমলা শুধুমাত্র মোদী-আনুগত্যের দৌলতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গভর্নর পদে সেইকালে বসতে পারেন নি। আমাদের আলোচনা বা সমলোচনা ইন্দিরা গান্ধি কিংবা রাজীব গান্ধির আমলে ভ্রান্ত ও জনস্বার্থবিরোধী আর্থ-রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে অগ্রসর করতে প্রাসঙ্গিক সময়কালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বেশ কয়েকটি রিপোর্ট প্রণিধানযোগ্য। একসময় এমন প্রতিবেদনে বেশ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছিল।

The first half of 1980s saw a large increase in the Central Government deficit, primarily on account of high expenditure levels, especially on agricultural subsidies, defence and interest payments. On the external account, higher imports dominated over acceleration in exports. A steady deterioration in the services account resulted in widening of the current account deficit (CAD) and with the aid inflows not increasing commensurately, the increasing reliance on commercial sources for financing resulted in debt-service ratio rising nearly 30.0 percent in the late 1980s ....

একই প্রতিবেদনের অন্যত্র উল্লেখ করা হচ্ছে

...By 1990, there was a realisation in the official circles that the widening of fiscal deficit and related rise in money growth were contributing to a rise in inflation and exerting pressure on the balance of payments (BOP). The Reserve Bank had evidently been expressing its concern to the government about the adverse implications of the deteriorating BOP position and the impact of rising fiscal deficit since the late 1989 but timely preventive measures were stalled by the uncertain political situation.

ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় মূলত যে কারণে তলানিতে ঠেকেছিল তার কিছুটা আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক হয়েছিল। সকলেই জানেন যে, রাজীব গান্ধির শাসনকালে বোফর্স কামান ক্রয় করা নিয়ে প্রায় ৬৪ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগে দেশ টালমাটাল হয়েছিল। নয়া উদারবাদী সংস্কার এদেশে পুরোদমে বাস্তবায়িত হবার আগে পর্যন্ত রাষ্ট্রিক প্রশাসনের উচ্চতম মহলে যে কোন দুর্নীতি জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো। বিগত বেশ কয়েক বছরে দুর্নীতি বিষয়ক দুশ্চিন্তার অবসান ঘটেছে। শাসকদের খোলাখুলি দুর্নীতি তা, কেন্দ্র বা রাজ্য যেখানেই হোক, তেমন কোনও গণপ্রতিবাদ আর লক্ষ করা যাচ্ছে না।

ওই সময়ে মাত্র ৬৪ কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হবার ফলে রাজীব গান্ধি বা কংগ্রেস দল সাধারণ নির্বাচনে পরাভূত হয় এবং বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। মোদী জমানায় যেমন নিশ্চিন্তে রাফায়েল যুদ্ধ বিমান সংক্রান্ত হাজার কোটি ডলারের দুর্নীতির অভিযোগের পরেও সরকারের গায়ে কোনও আঁচ পড়ে না! প্রধানমন্ত্রী কোনও উত্তর পর্যন্ত দেন না। অথবা পি এম কেয়ার্স ফান্ডের মতো একটি ব্যাপক দুর্নীতির প্রসঙ্গও সেভাবে জনমানসে কোনও দাগ ফেলে না। এমন অবস্থা সেই সময়কালে

এর পর ৬ পাতায়

ভারতের কথা : মোদির উত্থানের পশ্চাদপট

৫-এর পাতার পর

ছিল না। পশ্চিমবঙ্গে যে সরকার চলছে তাও তো আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত। পূর্বে এর ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ দুর্নীতি হলে সংবাদমাধ্যম আদৌ ছেড়ে কথা বলতো না। রাজ্যের প্রতিবাদী মানুষও পথে নামতেন উত্তাল বিক্ষোভে। এই প্রসঙ্গটি বিশেষ দুশ্চিন্তার ও ব্যাপক আলোচনার দাবি রাখে। দেশের গণমাধ্যমগুলির ভূমিকা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এখন নিন্দনীয়।

স্মরণে আছে যে, বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর সরকার মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতেই অটলবিহারী বাজপেয়ী লালকৃষ্ণ আদবানির নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। সরকারের পতন ঘটে। আদবানির রামরথ যাত্রা প্রায় সারা দেশে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। আর এস এস-এর মতো উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন দেশের নানা প্রান্তে ধর্মীয় বিভাজন নির্মাণের অপকর্মে প্রবৃত্ত হয়। রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় বহুমানুষ হতাহত। ইসলামকেন্দ্রিক উগ্রপন্থাও শক্তি সঞ্চয় করে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি গভীর নৈরাজ্যে পর্যবসিত হয়। এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী জঙ্গি রাজনীতির প্রবাহেই ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যায় ঐতিহাসিক সৌধটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বর্বরতার চূড়ান্ত। একই সঙ্গে হিংস্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ধারবাহিকতায় সমগ্র দেশের উল্লেখযোগ্য অংশে অগণিত প্রাণহানি ঘটে। দুই সম্প্রদায়ের মানুষদের মননে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার পরিবেশ উদ্বেগজনক ভাবেই তছনছ হয়ে পড়ে। সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর এক বড় অংশই নতুন করে ঘেটোর মধ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এমন সব ঘৃণ্য ঘটনাক্রম রাজনৈতিকভাবে বিজেপিকে বিশেষ 'ডিভিডেন্ড' দেয় কিংবা সাংগঠনিক প্রভাব বিস্তারে সহায়তা করে। নামে বেনামে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ এবং তাদের অনুচর সংগঠনগুলি অতীতের তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে।

ভি পি সিং সরকারের পতনের পরেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে দীর্ঘকাল কংগ্রেসের সক্রিয় নেতা ও পরবর্তীকালে জনতা পার্টির অন্যতম সংগঠক বর্ষীয়ান রাজনীতিক চন্দ্রশেখরকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সমর্থন প্রদান করে (১০ নভেম্বর ১৯৯০—২১ জুন ১৯৯১)।

বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং এবং তাঁর পর—

১৯৮৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস বিরোধী অধিকাংশ দলের সম্মিলনে জাতীয় ফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। ২ ডিসেম্বর ১৯৮৯ একদা কংগ্রেস নেতা, স্বচ্ছভাবমূর্তি এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়া বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং প্রধানমন্ত্রী পদে বৃত হন। তাঁর পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি এবং রাজীব গান্ধি সরকারের প্রথমদিকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনে অনেক ক্ষেত্রে আপসহীন ভূমিকাও তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল। শ্রেণিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি অবশ্যই পরিপূর্ণভাবে পুঁজিবাদ বিরোধী ছিলেন না। তবে বলা যায়, 'লিবেরাল' বা উদারপন্থী মনোভাব নিয়েই চলতেন। কিন্তু একাধিক প্রশ্নে তাঁর আপসবিহীন ভূমিকা ১৯৮৯-এ অকংগ্রেসী সরকার গঠিত হবার পর থেকেই মাঝে মধ্যে শাসক বলয়ে বিপত্তি ঘটাচ্ছিল। বিজেপি নেতৃত্ব সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। এবং মণ্ডল কমিশন প্রসঙ্গ তাদের সেই সুযোগ করে দেয়। অতি অল্পকালীন পরিসরে এই সরকার উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু করতে পারেনি।

চন্দ্রশেখরের অত্যল্পস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীত্বকালেই ভারতের ক্ষয়প্রাপ্ত হতাশাজনক অর্থনৈতিক বাস্তবতা প্রকাশ্যে বিস্ফারিত হয়। প্রকৃত অবস্থাটি এমনই করুণ হয়ে প্রতিভাত হয় যে, চন্দ্রশেখর সরকার সংসদীয় রীতি অনুযায়ী ৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় বাজেট পর্যন্ত পেশ করতে পারে নি। কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব অনুযায়ী বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয় ১৯৯১-এর জানুয়ারি মাসে মাত্র ১.২ বিলিয়ন ডলার। কয়েক মাস পরে এই সঞ্চয় জুন মাসে অর্ধেকেরও কম হয়ে পড়ে। মাত্র তিন সপ্তাহের মতো আমদানির সুযোগ। বিদেশ থেকে জ্বালানি তেল এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশগুলি কেনার ক্ষমতাও দেশের সরকার হারিয়ে ফেলে। অতীতের ঋণ পরিশোধ দূরস্থান, নিয়মমতো সুদের অর্থ জোগানোর ক্ষমতাও হারিয়ে যায়। ব্যালান্স অব পেমেন্টের বাধ্যবাধকতাও বিপর্যস্ত। দেশের সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

চন্দ্রশেখরের নেতৃত্বে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার প্রাথমিক ধাক্কা সামলানোর জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আই এম এফ-এর থেকে ২.২ বিলিয়ন ডলার নতুন করে ঋণগ্রহণ করে। বাধ্যতামূলক এই পরিস্থিতিতে চন্দ্রশেখর সরকার ভারতের সঞ্চিত স্বর্ণ ভাণ্ডার বিদেশে গচ্ছিত করার আশ্বাস দিয়েই এত পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। কঠিন শর্তে সম্মত হয় সরকার। ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৪৭ টন সোনা ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডে বিশেষ বিমান যোগে পাঠায়। আরও ২০ টন সোনা একই পদ্ধতিতে সুইস ব্যাঙ্কে পাঠানো হয়।

অর্থাৎ সর্বমোট ৬৭ টন সোনা বিদেশের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখেই ভারতের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির হাল ফেরানোর চেষ্টা। চরম অবমাননাকর অভূতপূর্ব আর্থিক সংকট। মাত্র দশদিন সময়ের মধ্যেই (২১ মে—৩১ মে ১৯৯১) এমন বিশাল পরিমাণের সোনা রাত্রির গভীর অন্ধকারে চার্টার্ড বিমানে বিদেশ যাত্রা করে। সেই বিয়োগান্তক সময়ে জাতীয় কংগ্রেস সামান্য অজুহাতেই চন্দ্রশেখর সরকারের প্রতি যে সমর্থন দিয়েছিল তা, প্রত্যাহার করে নেয়। নতুন করে সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি ও ব্যবস্থা। কৌতুককর, যে রাজীব গান্ধির ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষীর তাঁর শয়নকক্ষে উঁকিবুঁকি মারার অজুহাতে সরকারের পতন, সেই রাজীব গান্ধিই ৩১ মে ১৯৯১ নৃশংসভাবে নিহত হন। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হবার পরে জাতীয় কংগ্রেস নরসিমহা রাও-এর নেতৃত্বে দিল্লির সরকার গঠন করেন। সংখ্যালঘু অংশের সমর্থন পুষ্ট হয়েই সরকার ২১ জুন ১৯৯১ থেকে ১৬ মে ১৯৯৬ পর্যন্ত পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করে। বহুবিধ সম্ভব অসম্ভব রাজনৈতিক কূটকৌশল অবলম্বন করেই নরসিমহা রাও চলেছেন। তাঁর সেই দক্ষতা ছিল। কিন্তু তাঁর শাসনকালেই দেশের ইতিহাসে এক অনপনেয় কলঙ্ক লেপন করে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। প্রধানমন্ত্রী সব জেনে বুঝেও কিছু করেন নি।

নয়া উদারবাদী পথে ভারত

সেই সময় ভারতের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন ড. মনমোহন সিং। একদা বিশ্বব্যাঙ্কের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অর্থনীতিশাস্ত্রী ড. সিং কিছুটা পূর্বের গান্ধি পরিবারের সদস্যদের কৃতকর্মের কারণে এবং অনেকটা আন্তর্জাতিক লগ্নিকারী সংস্থাগুলির চাহিদামতো ১৯৯১ এর ১ জুলাই থেকেই নয়া উদারবাদী সংস্কারের পথে চলতে শুরু করেন। অন্য কোন পথ অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করা হয় নি। অবশ্যই একটি চরম ভীতিপ্রদ আর্থিক সংকটের বিষয় বিশেষ বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। বাস্তবতা অবশ্যই ছিল। কিন্তু পূর্ণত বিশ্বপুঁজিবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে ভারতের অর্থনীতির কাঠামোগত সংস্কারের যে পথ বাছা হয়েছিল তা, আদৌ দেশের মানুষের বৃহদংশ মেনে নিতে পারেনি। বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষদের যথার্থই আশঙ্কা ছিল যে, অর্থনৈতিকভাবে বিশেষ দুর্বল একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে উন্নত এবং অতি উন্নত রাষ্ট্রগুলির প্রতিযোগিতা কখনোই সমানে সমানে সম্ভব হতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি বা আগ্রাসী লগ্নিপুঁজির দাপটে ভারতের শ্রমিকশ্রেণি নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দেশের শাসকদের চূড়ান্ত গাফিলতি এবং বেপরোয়া আচরণের জন্য যে সংকট, তার সমাধানে শ্রমিকশ্রেণির ওপর কেন আক্রমণ সহ্য করার দায় চাপানো হচ্ছে। এমন সঙ্গত প্রশ্ন ১৯৯১-৯২ সালে বিশেষ ভাবে ওঠে।

ভি পি সিং সরকারের পতন ঘটে বিজেপির সমর্থন প্রত্যাহারে। এতো ভবিতব্যই ছিল। দেশের আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে কোনও প্রগতিশীল পরিবর্তন সম্ভাবনা বিনষ্ট করাই বিজেপির অভীষ্ট। তখনও ছিল, এখনও আছে। এই দলটি প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অনুবর্তী। আর এস এস প্রায় প্রতিষ্ঠা লগ্ন (১৯২৫) থেকেই ভারতের রাষ্ট্রিক কাঠামো একান্তভাবে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভাবাদর্শ নির্ভর করে নির্মাণে একনিষ্ঠ। এদেশে জাতিগত বৈরিতা বিশেষ উগ্রতার সঙ্গে অনুসরণ করার লক্ষ্যেই সুদূর অতীতে দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্‌গাতা। আর এস এস-এর সমগোত্রীয় সংগঠন হিন্দু মহাসভা (প্রতিষ্ঠা, ১৯১৫)। এই সংগঠনটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকালে নানা পর্যায়ে বিবিধ বিপত্তি সৃষ্টি করে ঔপনিবেশিক অপশক্তি ইংরেজদের নিবিড় সহায়তা করে গেছে। সাভারকারই প্রথম (২৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৫) সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের উল্লেখ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যিক শক্তির সহায়তা করেছিলেন। মুসলিম লীগ দীর্ঘ বারো বছর পরে জাতিগত বিভেদ নির্ভর রাজনৈতিক দল হিসাবে পাকিস্তান দাবি করে ১৯৩৭ সালে। তারা মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র স্বার্থে পাকিস্তান গঠনের দাবি জানায়। এ সব ইতিহাস চর্চায় বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ অনীহা। সাভারকারের প্রকৃত ইংরাজ-অনুগত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করবেন এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে কারামুক্তির প্রসঙ্গটি মোদী সরকার গোপন করে তাঁকেই মহান স্বাধীনতা যোদ্ধা বলে দেশের লোকসাধারণের মধ্যে প্রচার করে চলেছে। চূড়ান্ত মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে।

১৯৮৯-৯০ সালেও বিজেপি একই ধরনের বিষাক্ত কর্মসূচি নিয়েই চলেছিল। আবার সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে জাতীয় কংগ্রেস দলও ভি পি সিং সরকারের পতন চেয়েছিল। এই দলটির সমর্থন নিয়েই চন্দ্রশেখর অতি অল্প সময়ের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী পদে বসেছিলেন। সেই ক্ষমতা তিনি বেশিদিন ভোগ করতে পারেন নি। জাতীয় কংগ্রেসই সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। সে ইতিহাস বিস্মৃত হবার কোনও সঙ্গত কারণ নেই। সেই নির্দিষ্ট সময়েই পূর্বতন কংগ্রেস সরকারগুলির (ইন্দিরা ও রাজীব গান্ধির জমানা) চূড়ান্ত অবিমৃশ্যকারিতার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া ভারতের আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। চন্দ্রশেখরের প্রধানমন্ত্রীত্বকালেই সমস্ত ধরনের বিকৃতিগুলি দেশের জনজীবনে প্রবল অভিঘাত সৃষ্টি করে। তার রেশ এখনও বহন করতে হচ্ছে। বর্তমান সময়ে নরেন্দ্র মোদীর অপশাসন যেভাবে এদেশের শ্রমজীবী মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে প্রতিনিয়ত বিধ্বস্ত করে চলেছে তার মূল অনুসন্ধানে চন্দ্রশেখর জমানা সম্পর্কে ব্যাপক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে অতলান্ত আর্থসামাজিক বৈকল্যের গ্রাসে ভারতের সাধারণ জনজীবন। মোদী সরকার বিগত সাত বছর যাবৎ যে আগ্রাসী প্রক্রিয়ায় আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের সংকটমোচনে ভারতের অভ্যন্তরীণ সমাজ রাজনীতির জ্ঞানশূন্য সর্বনাশে উদ্যত। এর মূল অনুসন্ধানে বিগত দিনের অভিজ্ঞতাগুলি নতুন করে বিশ্লেষণ করা একান্ত জরুরি। মোহমুক্ত হয়েই বিজ্ঞানসম্মত পথে অদূর অতীতের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে বর্তমানের কর্তব্য স্থির করতে হবে।

অনেক টালবাহানার পর অবশেষে স্কুল খোলার অনুমতি দিতে বাধ্য হল রাজ্য সরকার

সুদীর্ঘ ২৩ মাস পরে খুলল স্কুলের দরজা। মুখোমুখি শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদের সাক্ষাৎ ও সহপাঠীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেয়ে ছাত্রশিক্ষক সহ স্কুল কলেজের কর্মচারীরা যথেষ্ট উৎফুল্ল। মূল গেটে ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকদের ভিড়, দু'বছর পরে নতুন পোশাকে ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে আসা এক অভিনব অভিজ্ঞতা।

শুধু মাত্র করোনা মহামারিজনিত লকডাউন নয়, রাজ্য সরকারের অনাবশ্যক টালবাহানার প্রতিবাদে মুখর হয়েছিল পিএসইউ, এসএফআই, এআইএসএফ, ছাত্র ব্লক সহ প্রতিটি প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন। নীরব থাকেননি অভিভাবক, চিকিৎসক সহ বৃহত্তর নাগরিক সমাজ। অনেকটা চাপে পড়েই অবশেষে স্কুল কলেজ খোলার অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছে রাজ্য সরকার। অষ্টম শ্রেণি থেকে নবম দশম একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে প্রবেশ করার আস্বাদ গ্রহণ করেছে ৩ ফেব্রুয়ারি থেকে। এতদিনে ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রবেশ করার অনুমতি পেল প্রাক্-প্রাথমিক থেকে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা। শুধু পুরোদমে ক্লাস শুরু নয়, মিড ডে মিলের রান্না করা খাবার খেতে পাত পেড়ে বসল ওরা।

তবে কোভিড বিধি মেনে ৫০ শতাংশ ছাত্রছাত্রীরা ৩০ মিনিট আগে থেকেই স্কুল গেটের সামনে ভিড় করে। তাপমাত্রা মাপার পর একে একে ক্লাসে প্রবেশ করল। সরকারি নির্দেশ মেনে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে একেকটি বেঞ্চে দু'জন করে ছাত্রছাত্রীকে বসানো হয়েছে।

অনেকদিন পরে স্কুলমুখী যানবাহনের ভিড় দেখা গেল রাস্তাঘাটে। যাত্রী ভাড়া না পেয়ে অটোচালক, রিক্সাচালকদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করা ভীষণ কঠিন হয়ে পড়েছিল। আজ অনেকদিন পরে তাদেরও মুখে হাসি ফুটল। বাসে বাসেও বাড়তি ভিড়ের ছবি। সরকারি স্কুলগুলি খুললেও বেসরকারি স্কুলের কর্তৃপক্ষগুলি বাড়তি নিরাপত্তার কারণে ধীরে ধীরে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাশ শুরু করছে। এখনো পর্যন্ত অনলাইন অফলাইন পঠন-পাঠনের রীতি বজায় রেখেছে নামীদামী বেসরকারি স্কুলগুলি।

এদিকে সরকারি নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের দরজা এখনো খোলে নি। নিরুপায় ছাত্রছাত্রীরা প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেল না খোলায় রাত কাটাচ্ছেন হস্টেলের বারান্দায়। ২০২০ সাল থেকে লকডাউনের ধাক্কায় ২০২০ সালের ২৬ মার্চ থেকে হিন্দু হস্টেল বন্ধ। এর আগেও হস্টেলের সংস্কার কাজ চলার জন্য টানা হস্টেল বন্ধ থাকায় আন্দোলনে শামিল হয়েছিল প্রেসিডেন্সীর ছাত্রছাত্রীরা। বাধ্য হয়ে আবার পুরো হস্টেল খোলার দাবিতে পথে নামতে হবে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত নন প্রেসিডেন্সী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা।

ইউরেশিয়ায় ডামাডোল

দিলীপ গোস্বামী

কাজাখস্তান, বেলারুশ, ইউক্রেন, ককেশাসের সাম্প্রতিক সংকটের আবর্তের ফলে ইউরেশিয় অঞ্চলের ভূরাজনীতিতে পূর্ণ বিন্যাস হতে চলেছে। পূর্ণ বিন্যাসের এই মহাযজ্ঞে রাশিয়া তার ভৌগোলিক নৈকট্য, রাজনৈতিক প্রভাবের জোরে মুখ্য ভূমিকায় রয়েছে। সম্প্রতি কাজাখস্তানের অপ্রত্যাশিত হিংসাত্মক প্রতিবাদে ১৬০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু এবং ৬০০০ জনের গ্রেপ্তারের ঘটনা সেন্ট্রাল ইউরোপ থেকে সুদূর মাঞ্চুরিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ স্তেপ অঞ্চলে যে ডামাডোল চলছে তারই অংশমাত্র।

বেলারুশ, ইউক্রেন, কাজাখস্তানে ভিন্ন ভিন্ন কারণে সংকট চলছে। সব মিলিয়ে ইউরেশিয়ায় এক ভূরাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস হতে চলেছে।

সোভিয়েত পরবর্তী ইউরেশিয়াতে আয়তনের দিক থেকে রাশিয়ার পরেই কাজাখস্তানের স্থান এবং কাজাখস্তানের আয়তন সমগ্র পশ্চিম ইউরোপের সমান। নববর্ষে এই দেশটিতে জ্বালানির দাম রাতারাতি দ্বিগুণ হয়ে যাওয়াতে স্বৈরাচারী প্রাক্তন শাসক প্রেসিডেন্ট নাহারবায়েভ এবং তারই অনুগত পরাধীন প্রেসিডেন্ট তোকায়েভের অপশাসনের বিরুদ্ধে বহুদিনের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটেছে, তেল, গ্যাস, ইউরেনিয়াম সহ জ্বালানি সম্পদই ২ কোটি মানুষের দেশ কাজাখস্তানের সমৃদ্ধির চাবিকাঠি। দেশের বৃহৎ অংশের মানুষের সরকার বিরোধী আন্দোলনে সামিল হওয়াটা অবশ্যই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

ভূ-রাজনৈতিক ও ভূ-অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দেশটির রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও স্থায়িত্বের জন্য বিগত ত্রিশ বছরে অগণিত পশ্চিমী, রুশ, তুর্কি, চিনা বিনিয়োগকারীরা কাজাখস্তানে বিনিয়োগের জন্য ছুটে এসেছে। এখানকার জ্বালানির বিপুল ভাণ্ডার ছিল এই আকর্ষণের মূল কারণ।

এই বিপুল বিনিয়োগ চরম স্বৈরাচারী শাসক নাজারবায়েভকে রাজনৈতিক দিক থেকে আরও সুদৃঢ় করেছিল। সেই সঙ্গে জনগণের উপর দুঃশাসন এবং শোষণের মাত্রাও চরমে উঠেছিল। এই বৃহৎ দেশটিতে অর্ধেক সম্পদের মালিক মাত্র ১৬২ জন। নাজারবায়েভ এবং নাজারবায়েভের অনুগত পরবর্তী প্রেসিডেন্ট তোকায়েভ যে অধিকাংশ মানুষের দুর্দশার মূলে। তা তাদের অজানা ছিল না। স্বতঃস্ফূর্ত গণ আন্দোলনের তীব্রতা বাগে আনতে না পেরে নাজারবায়েভের স্থলাভিষিক্ত তোকায়েভ আরও আক্রমণাত্মক পথ গ্রহণ করে নিজের সরকারকেই বরখাস্ত করেন। গ্রেফতার হলেন স্বয়ং এবং দেশের সন্ত্রাসদমন সংস্থার প্রধানকেও বরখাস্ত করা হয়। দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নির্ভরযোগ্য মনে না হওয়ায় তোকায়েভ রাশিয়ার Collective Security Treaty Organisation-র শরণাপন্ন হয়। ওয়ারশ চুক্তির উত্তরসূরী — CSTO অবিলম্বে কাজাখস্তানে আকাশপথে এবং স্থলপথে 'শান্তিরক্ষী' বাহিনী পাঠায়। অন্যদিকে সোভিয়েত পরবর্তী এই রাজনৈতিক পরিসরটিতে ক্রমশ প্রভাব বৃদ্ধিকারী চিন ইতিমধ্যেই তোকায়েভ সরকারের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ঘটনাপ্রবাহে আপাতত রাশিয়া চিন উভয় দেশই লাভবান মনে হচ্ছে। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা চিন রাশিয়া কাজাখস্তান চিনের ত্রিপাক্ষিক সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। অভিন্ন স্বার্থেই সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন এবং চায়না রেলওয়ে এক্সপ্রেসের কথাও উত্থাপিত হয়েছে। রাশিয়া চিন তাহলে ভবিষ্যতে কাজাখস্তানের সরকার বিরোধী আন্দোলনে দমন বা অঙ্কুরেই বিনা করতে যৌথভাবে উৎসাহী হবে কিনা, তা এক বড় প্রশ্ন।

প্রসঙ্গত, বেলারুশ, ইউক্রেন, ককেশাস, কাজাখস্তানের বর্তমান সংকটগুলির আলাদা আলাদা কারণ থাকলেও সব মিলিয়ে ইউরেশিয়ার এই দেশগুলির ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতির পূণবিন্যাস হতে চলেছে। মস্কোর কাজাখস্তানে সামরিক হস্তক্ষেপ ইউরোপের নিরাপত্তা সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দর কষাকষি ও আলোচনাতে বোঝা যায় ইউরেশিয়ার রাজনৈতিক মঞ্চে রাশিয়ার মুখ্য ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। ইউরেশিয়ার দেশগুলির অসমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের অসন্তোষজনক অগ্রগতি, আঞ্চলিক সংস্থাগুলির সীমাবদ্ধতা, উত্তর সোভিয়েত রাজনৈতিক পরিসরে এই দেশগুলি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণে সীমাবদ্ধতা, বৃহৎ শক্তিগুলির সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্কের অস্থিরতা ইউরেশিয় অঞ্চলের রাজনীতিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর কম্যুনিস্ট শাসিত প্রাক্তন সোভিয়েত য়ুনিয়নের অংশগুলির সাম্প্রতিক কালে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠছে। ইউরেশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণের প্রকল্প ব্যর্থ হওয়ার পর নতুন রাজনৈতিক মডেলের বাস্তবায়নের সম্ভাবনা দেখা যায়। মধ্য ইউরোপ এবং বাল্টিক অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিতে উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা দ্রুত কায়েম হলেও প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য সোভিয়েত-এর অংশগুলিতে কার্যত একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এদিকে বুদাপেস্ট ও ওয়ারশ ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের খবরদারিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে শুরু করে হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড পশ্চিমীদের মাথাব্যথার বিশেষ কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কাজাখস্তানের পরিস্থিতি ইতিপূর্বেই সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে। গত বছর বেলারুশের গণআন্দোলন প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কোকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলে। শেষ পর্যন্ত ক্রেমলিনের সাহায্য ও সহযোগিতা লুকাশেঙ্কোকে ক্ষমতাসীন থাকতে সাহায্য করে।

উত্তর সোভিয়েত জমানায় প্রাক্তন সোভিয়েত সংঘের রাষ্ট্রগুলিতে গণতন্ত্র কায়েমের লক্ষ্যে পশ্চিমী প্রকল্পগুলি নানা বিপত্তির সম্মুখীন হয়। এতদঞ্চলের রাজনৈতিক শূন্য পরিসরে ইসলামও বিশেষ সুযোগ গ্রহণে তৎপর হয়ে ওঠে। আফগানিস্তানে তালিবানদের প্রত্যাবর্তন এই ইসলামি তৎপরতার নিদর্শন বলা যেতে পারে।

এদিকে রাশিয়াতেও রক্ষণশীল খ্রীস্টান (Orthodex Christianity) এবং রোমান ক্যাথলিকরাও উত্তর সোভিয়েত জমানায় জনমানসে প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক শূন্যস্থান পূরণের খেলায় বিশ্বের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এক বিচিত্র নাটকের সাক্ষী বিশ্ববাসী। কারণ শূন্যস্থান কখনই চিরদিন শূন্য থাকে না।

এছাড়া মধ্য এশিয়ার অধিকাংশ রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিক বিশ্বায়নকে স্বীকৃতি দিলেও বিপুল পরিমাণ অর্থনৈতিক অসাম্য দূরীকরণে এরা সকলেই ব্যর্থ হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদে বিশেষ সম্পদশালী কাজাখস্তানে সহজেই অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করা সম্ভব হলেও, বাস্তবে তা হয়নি। জনগণের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ সব কিছুর মালিক হয়ে দেশের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। সমস্যাটা কেবল কাজাখস্তানেরই নয়, যে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা চলছে তা কেবল ভ্রষ্টাচার ও দুর্নীতির ধাত্রী নয়, এবং শুদ্ধিকরণের সম্ভাবনাও বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রায় নেই বললেই চলে।

প্রাক্তন সোভিয়েতগুলির একাংশ ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হলেও, ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের পশ্চিমাঞ্চল এবং পূর্বাঞ্চলের মধ্যে বিপুল বৈষম্য পূর্বাঞ্চলীয় রাষ্ট্রগুলির বিশেষ ঈর্ষার কারণ। দুই অঞ্চলের পারস্পরিক সম্পর্ক আদৌ স্বস্তিদায়ক নয়। প্রসঙ্গত পশ্চিম ইউরোপের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিনের প্রভাবের বাইরে ইউরোপীয়ান Strategic Autonomy র কথা বললেও মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি ব্রুসেলসের রাজনৈতিক খবরদারি বা আধিপত্য থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা পোষণ করে। এই রাজনৈতিক দাবা খেলায় ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের প্রতিপক্ষ হিসাবে মস্কোর প্রণোদনায় ইউরেশিয়ান ইকনমিক ইউনিয়ন এবং Collective Treaty Organisation প্রতিষ্ঠিত হয়, ইউরোশিয়ায় রাশিয়ার আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। মস্কো Shanghai Corporation Organisation এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যৌথভাবে মধ্যএশিয়ায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে বিশেষ তৎপর, অবশ্যই অর্থনৈতিক স্বার্থে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাক্তন অধিকাংশ সদস্যই সদ্য অর্জিত সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নয় এবং মস্কোর আধিপত্য স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়, তবে বাস্তব ঘটনা, এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান ঐতিহাসিক বাস্তবতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক জাড্যের অভাবের ফলে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে অংশ রাষ্ট্রগুলির পক্ষে প্রভাবের দীর্ঘকালীন রাশিয়ায় প্রভাবের বাইরে থাকাটা খুব সহজ নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে, কাজাখস্তানের কথা বলতে হয়, সঙ্কটের বিস্ফোরণ কাজাখস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে মস্কোর সাহায্য প্রার্থী হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না, কিন্তু রাশিয়ার উপর নির্ভরতা এবং প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে টানাপোড়েন চলছে চলবে। আর একটা দিকও বিশেষ ভাবনার বিষয়। উত্তর সোভিয়েত পর্বে একদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন অপর দিকে চিন এতদঞ্চলে নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।

প্রসঙ্গত বিপুল অর্থনৈতিক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, ব্রুসেলস এবং বেজিং ইউরোপের ইউক্রেনে। কাজাখস্তানে, আফগানিস্তানে রাজনৈতিক সংকট থেকে পরিত্রাণের কোনও দিশা দেখাতে পারেনি। পাশাপাশি তুরস্ক, সৌদি আরব, ইরান, পাকিস্তান, ভারত, কোরিয়া, জাপান মধ্য এশিয়ায় রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তারে তৎপর হলেও, এদের প্রত্যেকের সীমাবদ্ধতার জন্য ইউরেশিয়ায় রাশিয়া স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রাধান্য অনস্বীকার্য বাস্তব সত্য। তবে ইউরেশিয়ার রাজনীতিতে রাশিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হলেও এককভাবে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের শূন্য স্থানগুলিতে আধিপত্য বিস্তার রাশিয়ার পক্ষে বাস্তবত অসম্ভব।

একদিকে পশ্চিম ইউরোপ অপরদিকে চিনের সাথে সমঝোতা করেই রাশিয়াকে চলতে হবে। প্রসঙ্গত ইউরেশিয়ায় রাশিয়ার স্বাভাবিক প্রভাব প্রতিপত্তি সত্ত্বেও সম্প্রতি রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী দেশগুলির সম্পর্কের যে অবনতি হয়েছে বেজিং মস্কোর ঘনিষ্ঠতা বাড়লেও তা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা হয়ত নেই। তবে রাশিয়া এবং পশ্চিমের সঙ্গে ইউরোপের নিরাপত্তা নিয়ে যে আলাপ আলোচনার দরজা এখনও খোলা আছে এবং আলোচনা চলছে, সমঝোতার এক সাধারণ সূত্রও বেরিয়ে আসতে পারে।

ইউরেশিয়াতে রাশিয়ার প্রাধান্যকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মত অবস্থায় পশ্চিমী জোট নেই, তাছাড়া পশ্চিমী দেশগুলির আরও অনেক সমস্যাও আছে, চিনের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক আগ্রাসন এদের কাছে বিশেষ মাথা ব্যথার কারণ।

শেষ কথা, রাশিয়া ইউরেশিয়ার সবচেয়ে বেশি ওজনদার খেলোয়াড় হলেও রাশিয়ার পক্ষে এককভাবে গোটা অঞ্চলে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের জায়গাটা দখল করা অসম্ভব যা, ইতিপূর্বেই উল্লিখিত। পশ্চিম দেশগুলির সঙ্গে সমঝোতা করতেই হবে। ইউক্রেনের স্বাধীনতা এবং নিরপেক্ষতাতে স্বীকৃতি দিতে হবে, সামরিক সংঘর্ষ পরিহার করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে

মোদীর রাজত্বে ব্যাঙ্ক লুঠেরাদের স্বর্গরাজ্য

একের পর এক ব্যাঙ্ক কেলেঙ্কারির পর্দা ফাঁস হচ্ছে। এবিজি শিপইয়ার্ড সংস্থা সহ তাদের তিন ডিরেক্টার কমলেশ আগরওয়াল, সান্থানাম মুথুস্বামী ও অশ্বিনী কুমারের বিরুদ্ধে বাঙ্ক প্রতারণার অভিযোগে মামলা করেছে সিবিআই। ২৮টি ব্যাঙ্কের সঙ্গে ২২,৮৪২ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ করেছে সিবিআই।

এবিজি শিপইয়ার্ড কোম্পানী জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতির কাজ করে। কোম্পানির শিপইয়ার্ড রয়েছে গুজরাতের দহেজ এবং সুরাতে। ২০১২ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৭ সালের জুলাই-এর মধ্যে এই দুর্নীতির ঘটনার সঙ্গে জড়িত আছে এই কোম্পানির আটজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক। সিবিআই-এর দায়ের করা জালিয়াতির মামলায় এটাই সবচেয়ে বড় জালিয়াতি।

সিবিআই -এর অভিযোগ অনুযায়ী এদের কাছে স্টেট ব্যাঙ্কের পাওনা ২, ৯২৫ কোটি টাকা। আই সি আই সি আই-এর পাওনা ৭,০৮৯ কোটি টাকা। আই ডি বি আই এর পাওনা ৩,৬৩৪ কোটি টাকা। ব্যাঙ্ক অব বরোদার পাওনা ২,৬১৪ কোটি টাকা। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের পাওনা ১,২৪৪ কোটি টাকা। আই ও বি'র পাওনা ১, ২২৮ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে ২,৮৪২ কোটি টাকা। এই দুর্নীতি নীরব মোদীর দুর্নীতির চেয়েও বড় দুর্নীতি। সি বি আই প্রতারণার এফ আই আর করেছে এবিজি শিপইয়ার্ড ও ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেডের বিরুদ্ধে। একই গ্রুপের দুটো কোম্পানি সমস্ত নিয়ম কানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বহু দিন ধরে প্রতারণা করে চলেছে। শুধু ব্যাঙ্কগুলি নয়, এল আই সি'র সঙ্গেও ১৩৬ কোটি টাকা প্রতারণা করেছে। এই শিপইয়ার্ড কোম্পানী ব্যাঙ্কের টাকা প্রতারণা করে বিদেশে পাঠিয়েছে। ব্যাঙ্কগুলির পক্ষ থেকে ২০১৯-এর ৮ নভেম্বর প্রথম অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। ২০২০র ১২ মার্চ কিছু বিষয়ে ব্যাঙ্কের কাছে ঋণের ব্যাপারে ব্যাখ্যা চেয়েছিল। পরে ২০২০'র আগস্টে নতুন অভিযোগ দায়ের করেছে সিবিআই। সম্প্রতি তদন্তের পর ২০২২ এর ৭ ফেব্রুয়ারি সমস্ত তথ্য সহকারে অভিযোগ দায়ের করেছে সিবিআই।

Vol. 68 Issue No. 44 শনিবার ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ (যুগ্ম সংখ্যা) আট
RN No. 2710/57 Rupees Two [By Air Rs. 2.10]
Phone : 2229-4653; e-mail : kranti.press@yahoo.com
গণবার্তা

আসন্ন পৌরনির্বাচনে বামফ্রন্টের আর এস পি প্রার্থী তালিকা

(১) আলিপুরদুয়ার পৌরসভা

৫ নং ওয়ার্ড
কম. রাজা সরকার

৬ নং ওয়ার্ড
কম. টুম্পা সরকার (দেবরায়)

১৭ নং ওয়ার্ড
কম. ঝন্টু কুমার দাস

১০ নং ওয়ার্ড
কম. দিপালী সাহা

১১ নং ওয়ার্ড
কম. প্রণব রায়

১৯ নং ওয়ার্ড
কম. তপন কুমার ভৌমিক (তপা)

২০ নং ওয়ার্ড
কম. সন্ধ্যা পণ্ডিত

(২) ময়নাগুড়ি পৌরসভা

৩ নং ওয়ার্ড
কম. গৌতম রায়

১১ নং ওয়ার্ড
কম. সুবীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১২ নং ওয়ার্ড
কম. সিতেশ দত্ত

(৩) জলপাইগুড়ি পৌরসভা

১৯ নং ওয়ার্ড
কম. খগেশ্বর রায় প্রামানিক

(৪) মাল পৌরসভা

৬ নং ওয়ার্ড
কম. ভাদুমা শর্মা

৪ নং ওয়ার্ড
কম. মানিক পাল (বামফ্রন্ট ও আরএসপি সমর্থিত নির্দল প্রার্থী)

(৫) বালুরঘাট পৌরসভা

১ নং ওয়ার্ড
কম. চিত্রা মহন্ত

২ নং ওয়ার্ড
কম. ঝুমা বর্মন সরকার

৩ নং ওয়ার্ড
কম. সুনিতা মুর্মু

৪ নং ওয়ার্ড
কম. পঞ্চমী ভাদুড়ি

৫ নং ওয়ার্ড
কম. প্রলয় ঘোষ

৬ নং ওয়ার্ড
কম. নীলকমল সাহা (বাপি)

৭ নং ওয়ার্ড
কম. কল্যাণী রায়

৮ নং ওয়ার্ড
কম. গোপাল চক্রবর্তী

৯ নং ওয়ার্ড
কম. সুখময় সরকার (বিমান)

১১ নং ওয়ার্ড
কম. প্রণব কুমার ভড় (পাতা)

১৩ নং ওয়ার্ড
কম. অপর্ণা মহন্ত

১৪ নং ওয়ার্ড
কম. জয়ন্ত মণ্ডল

১৭ নং ওয়ার্ড
কম. প্রবীর দত্ত

১৮ নং ওয়ার্ড
কম. সাবিত্রী সাহা কর্মকার

১৯ নং ওয়ার্ড
কম. তাপস সাহা

২১ নং ওয়ার্ড
কম. সুচিত্রা মিত্র সরকার

২২ নং ওয়ার্ড
কম. অপূর্ব চক্রবর্তী (কাজল)

২৩ নং ওয়ার্ড
কম. সুপ্রিয় রায় (শঙ্কু)

২৪ নং ওয়ার্ড
কম. নিবেদিতা সেন মান্না (ঝুমা)

(৬) ওল্ড মালদা পৌরসভা

৮ নং ওয়ার্ড
কম. সঞ্জনা বর্মন

৯ নং ওয়ার্ড
কম. তৃপ্তি পান্ডে

২০ নং ওয়ার্ড
কম. ডি এস সৌমিক পাণ্ডে

(৭) ইংরেজবাজার পৌরসভা

৬ নং ওয়ার্ড
কম. তনুশ্রী চৌধুরী (মাম্পি)

(৮) বহরমপুর পৌরসভা

৪ নং ওয়ার্ড
কম. প্রদীপ দত্ত

২০ নং ওয়ার্ড
কম. মধুমিতা দাশগুপ্ত

২২ নং ওয়ার্ড
কম. তিমির হরণ দত্ত

২৪ নং ওয়ার্ড
কম. বিকাশ শীল

২৮ নং ওয়ার্ড
কম. নির্মল সরকার

(৯) জঙ্গিপুর পৌরসভা

১০ নং ওয়ার্ড
কম. মমতাজ বিবি

২০ নং ওয়ার্ড
কম. তিনকড়ি সরকার

(১০) বোলপুর পৌরসভা

৬ নং ওয়ার্ড
কম. সঙ্গীতা হাজরা

৭ নং ওয়ার্ড
কম. রঞ্জিত প্রামানিক

(১১) কৃষ্ণনগর পৌরসভা

৬ নং ওয়ার্ড
কম. প্রদীপ সরকার

৭ নং ওয়ার্ড
কম. বিপ্লব সরকার

(১২) রানাঘাট পৌরসভা

১০ নং ওয়ার্ড
কম. করবী সেন

(১৩) গয়েশপুর পৌরসভা

১১ নং ওয়ার্ড
কম. আশারানী মণ্ডল

(১৪) কল্যাণী পৌরসভা

৬ নং ওয়ার্ড
কম. বাবুলাল দাস

৮ নং ওয়ার্ড
কম. শান্তি ওরাও

(১৫) তাহেরপুর নোটিফায়েড এরিয়া

৬ নং ওয়ার্ড
কম. নমিতা দত্ত

(১৬) বরানগর পৌরসভা

২৬ নং ওয়ার্ড
কম. গৌতম দে

(১৭) দক্ষিণ দমদম পৌরসভা

২০ নং ওয়ার্ড
কম. সনৎ ঘোষ

(১৮) দমদম পৌরসভা

১৯ নং ওয়ার্ড
কম. বিশ্বজিত দাস

(১৯) পানিহাটি পৌরসভা

২৫ নং ওয়ার্ড
কম. শ্রীতা ভট্টাচার্য

২৭ নং ওয়ার্ড
কম. সঙ্গীতা পাল

(২০) হুগলী চুঁচুড়া পৌরসভা

১৮ নং ওয়ার্ড
কম. চম্পা বসাক

১৯ নং ওয়ার্ড
কম. সেখ শাহজান

(২১) কোন্নগর পৌরসভা

৪ নং ওয়ার্ড
কম. অশোক চক্রবর্তী

(২২) বর্ধমান পৌরসভা

৯ নং ওয়ার্ড
কম. রঞ্জিত সিনহা

৩৪ নং ওয়ার্ড
কম. ডাঃ সেখ সামসুদ্দিন

(২৩) বাঁকুড়া পৌরসভা

৩ নং ওয়ার্ড
কম. কাজল কুন্ডু
(আরএসপি মনোনীত ও বামফ্রন্ট সমর্থিত নির্দল প্রার্থী

৯ নং ওয়ার্ড
কম. মৃত্যুঞ্জয় লাহা

(২৪) সোনামুখী পৌরসভা

৭ নং ওয়ার্ড
কম. তপন দত্ত

(২৫) পুরুলিয়া পৌরসভা

১৭ নং ওয়ার্ড
কম. রবিশঙ্কর দত্ত

(২৬) রঘুনাথপুর পৌরসভা

৪ নং ওয়ার্ড
কম. খুশবু শর্মা

(২৭) কালিয়াগঞ্জ পৌরসভা

২ নং ওয়ার্ড
কম. লাল্টু দাস

(২৮) ইসলামপুর পৌরসভা

১২ নং ওয়ার্ড
কম. তারামনি ঘোষ

(২৯) ধুলিয়ান পৌরসভা

১৪ নং ওয়ার্ড
কম. বদরুল ইসলাম
(আরএসপি সমর্থিত নির্দল প্রার্থী)

কৃষি সমস্যা সমাধানের দাবিতে পূর্ব বর্ধমানে আর এস পি'র গণডেপুটেশন

কৃষি সমস্যার সমাধানের দাবিতে গত ২ ফেব্রুয়ারি আর এস পি পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলাশাসকের কাছে গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। আর এস পি রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কম. রাজীব ব্যানার্জীর নেতৃত্বে এর প্রতিনিধিদল ডেপুটেশন দেন। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা দলের আর এস পি পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য কম. স্বপন মালিক, কম. নূর মহম্মদ ও কম. আবুল হোসেন, ডেপুটেশন চলাকালীন বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কম. রাজীব ব্যানার্জী বলেন বলেন, কৃষি ব্যবস্থার সঙ্কটের ফলে গরিব, নিম্নবিত্ত মানুষ বিপর্যস্ত। কৃষক ফসলের দাম পাচ্ছেন না, অপরদিকে খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে চলেছে। সরকারের নির্ধারিত ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে প্রকৃত কৃষক ধান বেচতে পারেন না। মহাজন, ফোরেরা সব নিয়ন্ত্রণ করছে। অন্যের জমিতে চাষ করা অনথিভুক্ত কৃষকরা সরকারি সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। কৃষকদের সঙ্কটের সুযোগে মাইক্রো ফিন্যান্স কোম্পানিগুলির কারবার বাড়ছে। জেলা কমিটির সদস্য কম. আবুল হোসেন বলেন যে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত। ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হচ্ছে না। জেলায় একের পর এক কৃষক আত্মহত্যার ঘটনায় তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন আর ওয়াই এফ রাজ্য সহ সম্পাদক কম. রঞ্জিৎ মজুমদার।

জেলা সমাহর্তাকে দেওয়া দাবিপত্র :

আপনি ইতিমধ্যেই অবগত হয়েছেন সম্প্রতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে রাজ্যের অধিকাংশ জেলায় ধান, আলু সহ ফসল নষ্ট হওয়ায় কৃষকরা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। একই অবস্থা পূর্ব বর্ধমান জেলার কৃষকদের।

এমতাবস্থায়, এই জেলা তথা রাজ্যের অন্যতম রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আর এস পি অভাবী ও দুর্দশাগ্রস্থ কৃষকদের স্বার্থে নিম্নলিখিত দাবিগুলি পূরণের দাবি জানাচ্ছে।

(১) বর্গা চাষীদের যাঁরা এখনও আইনসম্মত পরচা পাননি, তাদের অবিলম্বে তা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(২) ভাগ চাষে বা চুক্তি চাষে যুক্ত কৃষকদের নাম নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া জেলা প্রশাসনকেই গ্রহণ করতে হবে।

(৩) এ বছর অতি বৃষ্টির কারণে প্রকৃত চাষীরা যে পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন তা পূরণ করতে জেলা প্রশাসনকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে।

(৪) প্রকৃত চাষী ব্যতীত অন্য কেউ যাতে ক্ষতিপূরণ না পায় সেইদিকে জেলা প্রশাসনকে কড়া নজরদারি রাখতে হবে।

(৫) পূর্ব বর্ধমানের কৃষকরা যেভাবে মহাজন বা ফোরেদের কাছে সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে ধান, গম বেচতে বাধ্য হচ্ছেন তা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং কৃষকরা যাতে তাদের উৎপাদিত ফসলের মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস পান তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

(৬) জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে কৃষকবন্ধুরা তাদের উৎপাদিত ফসল যাতে রক্ষা করতে পারেন তার জন্য জেলা প্রশাসনকে কৃষি বিজ্ঞানী ও কৃষকদের নিয়ে যৌথ কর্মশালার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৭) জীবন-জীবিকা এবং পরিবার প্রতিপালনের স্বার্থে পূর্ব বর্ধমান জেলার ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলির কাছ থেকে একপ্রকার বাধ্য হয়ে উচ্চ সুদের হারে কৃষকরা ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছেন এবং ফসল বিক্রি করে তা পরিশোধ করতে অপারগ হয়ে ক্রমশ যেভাবে ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন ও কৃষিকাজ বন্ধ করে প্রবাসী শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়ে ভিন্ন রাজ্যে চলে যাচ্ছেন, তা অবিলম্বে বন্ধ করতে পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনকে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(৮) প্রতিটি ফসলের খরচের দেড় গুণ ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা ও সরাসরি কৃষকদের থেকে ফসল কিনতে মাঠে কৃষি দপ্তরকে কর্মসূচি নিতে হবে।

(৯) কৃষকের থেকে কেনা খাদ্যশস্য ভর্তুকি মূল্যে রেশনের মাধ্যম জনগণকে প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(১০) কৃষি ঋণ, শস্যবীমা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রকৃত চাষীদের অগ্রাধিকার ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

(১১) সার, কীটনাশক, বীজে কালোবাজারি বন্ধ এবং কৃষি উপকরণ বিলিতে স্বচ্ছতা আনতে হবে।

(১২) বাস্তুতন্ত্র রক্ষা করতে পারলে কৃষি ও কৃষক লাভবান হবেন তাই, জলাশয় বাঁচানো ও কৃষিজমি রক্ষা করতে হবে।

(১৩) সমবায় প্রথায় চাষে উৎসাহ দেওয়া যায় কিনা সেটা দেখতে হবে।

আশা রাখি, পূর্ব বর্ধমান জেলার সর্বোচ্চ প্রশাসক হিসাবে এই জেলার অর্থনীতির মূল স্তম্ভ কৃষি ও কৃষকদের রক্ষা করতে আপনি আমাদের ভাবনার প্রতি যথাযথ মর্যাদা দিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

Printed and published by Manoj Bhattacharya from Kranti Press, 37 Ripon Street, Kolkata-700 016, Editor : Manoj Bhattacharya of behalf of RSP (Website : www.ganavarta.com)
Price Rs. 2/-